আমার একটা দুঃখ আছে

আনিসুল হক



সে ছিল এক হাঁক-ডাকের শহর। সেখানে ভোর হতো কাকের ডাকে; কিন্তু তারও আগে, রাতের নীরবতা ভাঙতো ঘড়ি কিংবা টিকটিকির টিকটিক রব। বাথরুমের ঢিলে ট্যাপ বেয়ে ঝরে পড়তো ফোঁটা ফোঁটা পানি, শব্দ হতো টিপটিপ। সেই নীরবতা ও টিপটিপ শব্দকণার ঐকতান ঘিরে শোনা যেতো পাহারাদারের রব— হৈ। শুঁড়িখানা বন্ধ হয়ে গেলে টলতে টলতে ফুটপাত মাড়াতো মাতালের পা, তাদের আত্মগত বকবকানি ঝরে পড়তো নিয়ন সাইন আর সোডিয়াম বাতির হলুদ আলোর মশারি বেয়ে। মানুষের ঘুম ভাঙতো উপসনালয়গুলো থেকে ভেসে আসা পুণ্যের উচ্চকিত আহ্বানে, তারপরেই ধ্বনিত হতে থাকতো বিচিত্র ভ্রাম্যমাণ বিপণীর প্রচার-প্রচারণা— ফেরিওয়ালার ডাক। 'চাই মুরগি' হাঁকটা ছিল তীক্ষ্ণ, আর তা মিলিয়ে যেতো দ্রুত, বোঝা যেতো যে, মুরগিওয়ালা হাঁটে দ্রুত, কিন্তু 'তূলা নিবেন তূলা শিমুল তূলা' বলে হাঁকতো যে লোকটা, তার আওয়াজ ছিল মৃদু, আর দীর্ঘস্থায়ী। 'আছে পুরানো শিশি-বোতল খবরের কাগজ' বলে দীর্ঘলয়ের ক্লান্তিকর হাঁক শোনা যেতো সকাল ন'টার দিকে, প্রায় ঘন্টাখানেক চলতো এই হাঁকডাক, তারপর এই পুরোনো শিশি-বোতল-কাগজওলারা যে কোথায় চলে যেতো, সারাটি দিন আর তাদের দেখা নেই। 'রাখবেন তরকারি' বলে আসতো সবুজ বেচা মানুষ, স্বাস্থ্য আর খামারবাড়ির কুশল নিয়ে, শিংমাছ চিংড়িমাছের পসরা সাজিয়েও শহরের পুরোনো আবাসিক এলাকার বিবর্ণ পথে হাঁকতো কেউ কেউ। চানাচুরওয়ালার আপাদমস্তক ঢাকা থাকতো লাল কাপড়ে, মাথায় চোঙা লাল টুপি, আর তার পায়ে থাকতো ঘুঙুর। হাতের ঠোঙ মুখে লাগিয়ে সে শব্দ তুলতো— 'ঘটি গরম'। মনে হতো পানির ভেতর থেকে বুড়বুড়ি তোলা এই শব্দ, যেমন শব্দ হয় হুঁকোয় টান দিলে। সস্তার আইসক্রিমওয়ালারা তাদের বরফ রাখা বাক্সের ঢাকনা তুলে আবার বন্ধ করে

আওয়াজ তুলতো ধুপধাপ, সঙ্গে ছোট্ট আকস্মিক চিৎকার 'আইসক্রিম', আর একটু দামী আইসক্রিমওয়ালারা চলতো তিনচাকার গাড়িতে, তারা বাজাতো ঝুমঝুমি। চাবি বানানোওয়ালারা কিন্তু একগোছা চাবি হাতে নেড়ে নেড়েই এমন শব্দ তুলতো, যার চাবি হারিয়ে গেছে, সে ঠিকই বুঝে নিতে পারতো কে এসেছে। যেমন বাচ্চাদের বেলুনওয়ালারা বেলুনের গায়ে হাত ঘষে এমন বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ তুলতো যে, নাগরিকদের গায়ের রোম খাড়া হয়ে যেতো, তাদের মনে হতো, বুঝি দাঁতের নিচে বালি পড়ে কচ কচ করছে। শিশুরা কিন্তু ঠিকই ভালোবাসতো সেই কড়কড়ে বেলুনিয়া আওয়াজ। ভিক্ষুকদের আবেদন হতো ছন্দময়, তাতে থাকতো বিলাপ আর বিধাতার নাম; তবে একেক জন ভিক্ষুক হাঁক ছাড়তো একেক সুরে। মাঝে মধ্যে বেরুতো ভিক্ষুকদের কাফেলা, পাঁচজন পা-নেই ভিক্ষুক গড়াতে গড়াতে যেতো পথের পাশ দিয়ে, আর তারা গাইতো সমবেত সঙ্গীত। তারা যখন চলতো, তখন সমস্তটা জনপদ উচ্চকিত হয়ে উঠতো, মনে হতো কী যেন একটা ঘটে যাচ্ছে রাস্তায়। বাড়ির পুরুষ মানুষেরা কাজে চলে যাওয়ার পর পথে নামতো বেদেনির দল, সাপের গায়ের মতো পিছল কোমর দুলিয়ে তারা বয়ে নিয়ে যেতো চুড়ি ভরা ঝাঁকা, আর চুড়ি বিক্রির ফাঁকে ফাঁকে গিন্নিদের শোনাতো তাদের অলৌকিক নানা ক্ষমতার কথা, জানাতো তাদের কাছে আছে বশীকরণ তাবিজ, যা বাহুতে বাঁধলে উদাসীন স্বামী গৃহমুখী হয়, মুখরা ননদিনীর বিয়ে হয়ে যায় সত্বর। কান পরিষ্কার করা লোকটিকে দেখা যেতো কদাচিৎ, যেমন হঠাৎ হঠাৎ আসতো শিলপাটা ধার করার কারিগর। ছুরি-বঁটি ধার করার লোকটাকে দেখা যেতো বছরে মাত্র একবার, পশু-উৎসর্গ-উৎসবের আগে। চটপটি-ফুচকাওয়ালার থাকতো চার চাকার গাড়ি; চিনে-বাদামওয়ালারা অবশ্য গলায় ডালি ঝুলিয়েই বেরিয়ে পড়তো সচরাচর। 'চাই বাদেম'— কী অজ্ঞাত কারণে তারা বাদামকে বলতো বাদেম।

মোট কথা, সেই শহরটা ছিল ফেরিওয়ালাদের শহর। ফেরিওয়ালারা যখন একাট্টা হতো, তখন তারা নিজেদের বলতো হকার্স, আর তাদের থাকতো হকার্স ইউনিয়ন, তারপর তারা দখল করে ফেলতো ফুটপাত; মাঝে মধ্যে শহর কর্তৃপক্ষ তাদের হটাতে চাইতেন ফুটপাত থেকে, তারা বলতো— আগে চাই বিকল্প জায়গা, চাই পুনর্বাসন, তখন তাদের জন্যে বানিয়ে দেওয়া হতো হকার্স মার্কেট। এরপর তারা নতুন হকার্স মার্কেট আর পুরোনো ফুটপাত দু'টোরই অধিকর্তা বনে যেতো পারতো।

এই ফেরিওয়ালা কবলিত শহরে একদিন দেখা দিলো এক নতুন ফেরিওয়ালা। অভিনব ফেরিওয়ালা। সেদিন ছিল ছুটির দিন। তখন দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে বিকেলের দিকে। অফিস-ক্লান্ত লোকজন বাড়িতে পেটপুরে দুপুরের খাবার খেয়ে কেবল

বিছানায় একটু গা লাগিয়েছে, চোখে ভাতঘুম, বাড়ির পেছনের নিঃসঙ্গ কাঁঠাল কিংবা কদম কিংবা কৃষ্ণচূড়া গাছটায় হঠাৎ ডেকে উঠেছে কোকিল— আরে আরে বসন্ত এসে গেছে বলে পাশ ফিরে শুয়েছে কোনো বিশ্রামে বিধ্বস্ত আমলার মোটা স্ত্রী, বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় তার হাতে হাতপাখা নড়ছে তবু হাঁসফাঁস গরম; আর কোকিল কোথায় ডাকে, কেন ডাকে— বলে হোমওয়ার্কের টেবিলে বসা কোনো কিশোরীর চিত্ত সামান্য বিক্ষিপ্ত; আকাশী-চ্যানেলে আজ এটা কী সিরিয়াল দেখাচ্ছে, কাগজে প্রোগ্রাম ভুল ছেপেছে বলতে বলতে সে টেলিফোনে ব্যাপারটার তদন্ত করবে কি করবে না; আর সব চঞ্চল শিশু ঘুমের অতলে— কেননা বাবা-মা ভয় দেখিয়েছেন পুলিশ-জুজুর (সে শহরে জুজুর নাম ছিল পুলিশ, বিশেষ করে শিশুদের জন্যে পুলিশের মতো জিঘাংসা-বিরংসা-ভয়ঙ্কর আর কিছুই ছিল না); তখন হঠাৎই এক শান্ত মহল্লার ধূসর রাস্তায় কে যেন খুব দুঃখী গলায় বলে উঠলো— 'গল্প নেবেন গল্প! রাখবেন গল্প— গরম গল্প ভাপ ওঠা, নরম গল্প তুলতুলে, শক্ত গল্প চটাং চটাং— গল্প নেবেন গল্প, টাটকা গল্প, হাট কা গলা... গল্প নেবেন গল্প!'

ইস্পাতের ছুরি বা চামচ জিভে ছোঁয়ালে যেমন না-নোন্‌তা না-তেতো অদ্ভুত স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনই এক স্বাদ ছিল এই ফেরিওয়ালার হাঁক-ডাকে। সে ভারি নতুন অভিজ্ঞতা। কৌতূহলোদ্দীপক। বিছানায় উপুড় হয়ে বুকে বালিশ গুঁজে ফ্যাশন পত্রিকায় বিদেশী সংগীতজ্ঞের ছবি পড়ছিল যে কিশোরীটি, গতরাতে শুরু করা টেলিফোনালাপ আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত রেখে যে তরুণীটি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখাতে যাচ্ছে, কম্পিউটারের ইন্টারনেটে ধুত্তোরি নতুন আর কী আছে বলে হাই তুলছে যে কিশোর, আজ ছুটির দিনেও কেন বাবা-মা একসঙ্গে বাইরে গেলো— আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো না— আজ দুপুরে কিচ্ছু খাবো না— অফিসের পার্টি, মিস্টার এন্ড মিসেস যাবেন, কিড্‌স আর নট অ্যালাউড— বোঝো না কেন— না, কিছুতেই বুঝতে চাইছে না চোখে মোটা লেন্সের চশমা আঁটা যে বালক— তাদের সবাই এই ডাক শুনতে পেলো। রাখবেন গল্প, গরম গল্প ভাপ ওঠা, নরম গল্প তুলতুলে, শক্ত গল্প চটাং চটাং... শুধু শুনতে পেলো, তাই নয়, দেখতেও পেলো, তাদের ঘরের জানালা দিয়ে, গবাক্ষ দিয়ে— যেখানে যতোটুকু ফুটো পাওয়া গেলো, তাই দিয়ে— এই অদ্ভুত হাঁক নীল ধোঁয়ার মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে, ভাসছে ঘরের পরিসরে; তাদের সবাই বুঝতে পেলো— এই হাঁক যিনি হাঁকছেন, তিনি তাদের মতোই বড়ো দুঃখী, দুঃখী কিন্তু ভালোমানুষ; মনে হয় তার অন্তরের নিভৃত কোণে টলমল করছে শাদা অশ্রু, কিন্তু তার চোখ শুকনো, তার শাদা চোখের কালো মণিটি ঘিরে এক ফোঁটা-দু ফোঁটা অশ্রু জমাট বেঁধে রক্তবর্ণ ছিটে হয়ে আছে, আর

লোকটার চুল এলোমেলো, সামান্য কোঁকড়ানো, একটুখানি লম্বা, তাতে কে যেন তার দুঃখী আঙুলগুলো চিরুনির মতো চালিয়ে দিয়েছে, তার চোখের নিচে কালো দাগ, যেন সুরমা লাগাতে গিয়ে অসর্তক সৃষ্টিকর্তা তার চোখের নিচে ভুল জায়গায় আঙুল চালিয়ে দিয়েছেন, ফলে লোকটা দুঃখের দুটো কালোব্যাজ স্থায়ীভাবে ধারণ করে নিয়েছে তার গণ্ডদ্বয়ে, তার ঠোঁট মোটা মোটা, তাতে দুঃখের দাগ প্রকট হয়ে আছে।

গল্প নেবেন গল্প!

অমন করে কেউ তো তাদের কখনো শুধোয়নি।

এ-শহরের শিশু আর কিশোরেরা ভারি অবাক হলো। গল্প আবার নেওয়ার জিনিস হতে পারে নাকি!

কিন্তু সেই ধাতব হাঁক, সুর করে কওয়া আর কেমন দুঃখী দুঃখী, তাদের মনে জাগিয়ে তুললো গল্পের চাহিদা। তাদের কে যেন বললো, অ্যাই ছেলেপুলের দল, তোরা সব গল্পের কাঙাল, গল্পের তৃষ্ণায় তোদের কলজে ছটফট করছে— জানিস তোরা, তোদের পূর্বপুরুষ, তোদের আগের প্রজন্মের মানুষের শৈশবগুলো ছিল কেমন গল্পময়, তারা শৈশবে ঘুমুতে যেতো গল্প শুনতে শুনতে, মা তাদের শোনাতেন ডালিমকুমার আর মেঘবতী রাজকন্যার গল্প, দাদিমা তাদের শোনাতেন ঘুঘু আর ফাঁদের গল্প, পিঠাগাছের গল্প, ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমীর গল্প, হীরামন পাখি আর তেপান্তরের মাঠের গল্প। সেইসব গল্প শুনে তোদের বাবা-চাচা-খালা-মামারা চোখ বড়ো বড়ো করতো, চোখ বুজে ফেলতো, ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে তারা চলে যেতো রূপকথার রাজ্যে, সেখানে সোনার গাছে রুপোর ফল, হীরের নদীতে মানিকের মাছ; সেখানে সুয়োরানী আর দুয়োরানীর জীবনে নানা সংঘাত, সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠিতে ঘুমন্ত রাজকন্যার জীবন-মরণ— কতো কী! কিন্তু সেসব তোরা শুনতে পেলি কই! তোদের শৈশবের কল্পরাজ্য জুড়ে হৈচৈ করতে শুরু করলো কার্টুন আর কমিক্স, নার্সারি রাইমস, হোমওয়ার্ক, হ্যান্ডওয়ার্ক, টেলিভিশন আর রিমোর্ট কন্ট্রোল আর টেলিফোন আর কম্পিউটার। তোদের বাবা ছুটছেন, মা ছুটছেন, কী যে এক সোনার হরিণের পিছে অহোরাত্র বিরামহীন তাদের ছুটে চলা! পরিচারিকার হাতে, ডে-কেয়ার সেন্টারের হাতে সমর্পিত তোদের সকাল-দুপুর-বিকেল... শেয়াল পন্ডিতের পাঠশালাও তোদের নেই, নেই কুমির ছানা ছাত্র, বাঁদরের হৃদপিন্ড বাঁধা থাকে না গাছের মগডালে— গল্প তো তোরা শুনতে চাইবিই।

তারপর সেই দুপুরবেলা, পড়ন্ত দুপুর, ঘুমন্ত, অর্ধজাগ্রত, তন্দ্রাতুর ঘরবাড়ি-ফ্লাট-দরদালানের বন্ধ কপাট খুলে যেতে লাগলো দুদ্দাড়, খুলে গেলো সদর দরজা; বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী সব নেমে এলো রাস্তায়, যার যার বাড়ির সামনে,

কোথায় ওই দুঃখী গলার গল্পওয়ালাটা, এ তো ভারি মজার ব্যাপার যে, লোকটা হেঁকে হেঁকে গল্প বিক্রি করছে! লোকটা, বেশ লম্বাই হবে হয় তো, গায়ে মলিন পুরোনো কোট, এই গরমেও লোকটা কোট পরেছে কেন, পরনে একটা খয়েরি ট্রাউজার, পায়ে একজোড়া জীর্ণশীর্ণ জুতা, আর পিঠে একটা অদ্ভুত ছাইরঙা কাপড়ের ঝোলা, থলেটার পেট মোটা, বোধ হয় নানান গল্পে সেটা ঠাসা, আর গল্পগুলোও তেমন হাল্কা নয় বলতে হবে, কেননা ঝোলার ভারে লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছে।

লোকটা হাঁটছে, তিন নম্বর রাস্তার ভাঙা ফুটপাত ধরে, গোধূলি নামের যে দোতলা সিরামিক ইটের বাড়িটা চক চক করছে, যে বাড়িতে রয়েছে তিন তিনটা উর্দি পরা দারোয়ান, তার উল্টোদিকে লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে গল্পওয়ালা করুণ চোখে এ দিক ও দিকে তাকাচ্ছে, তার তাকানোর ভঙ্গিতেই ঝরে পড়ছে কী ক্লান্তি, যেন তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা ছায়াটাও ক্লান্ত— সব বাড়ির দরজা থেকে কিশোর-বালকেরা দেখছে তাকে, লোকটা লাইটপোস্টের গায়ে লেগে থাকা চুনের দাগের দিকে তাকায়, তারপর বিড় বিড় করে। আজ সে গল্প এনেছে গরম গরম কিন্তু একটা গল্পও তার বিক্রি হয়নি! সে ভাবে— গল্পগুলো আজ যদি বিক্রি না হয়, তাহলে সব বাসী হয়ে যাবে। তার নিজের ঘরে ফ্রিজ নেই বলে গল্পগুলো রাখতে হবে পাড়ার কোল্ডড্রিংসের দোকানের ফ্রিজে। সকালবেলা বের করে নিয়ে আবার গরম করতে হবে সে সব। তাতে ঝামেলা হবে, হোক। কিন্তু ফ্রিজের জিনিস গরম করে গ্রহণ করলে সেসবের গল্প কি আর ঠিক থাকে! গল্প তো মরে যায়!

আর এতো কষ্ট করে এতো আগ্রহ ভরে সারারাত জেগে সে বানিয়েছে এ গল্পগুলো! কেউ এ-সবের একটাও গ্রহণ করবে না। একটা গল্পও বিক্রি হবে না! খেয়ে কেউ বলবে না যে কেমন লাগলো। কেমন হলো! গল্পওয়ালার মন খুব খারাপ হয়। সেই মন খারাপের রেশ পড়ে তার এবারের হাঁকে— সে খুব করুণ সুরে ডেকে ওঠে— গল্প নেবে গো ভাইবোনেরা, গল্প-ও-ও-ও, খুব দুঃখের গল্পরে ভাই, খুব কষ্টের গল্প, হাসির গল্পও আছে, হাসতে হাসতে কাঁদবে, আবার কাঁদতে কাঁদতে হাসবে, তেমনও পাবে।

তার সেই নীল আওয়াজ, ধাতব স্বাদ, গিয়ে টংকার তোলে 'গোধূলি' নামের বাড়িটার বিশাল লোহার গেটে। ধাম্ করে শব্দ হয়। গেটের দ্বাররক্ষীরা, যারা দুপুরের ভাতঘুমে (দাঁড়িয়ে থেকেও) কাত, চমকে ওঠে। প্রথমে তারা দৌড়ে কোথায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে, তা ভাবতে থাকে, বুদ্ধিতে কুলোয় না বলে তিনজন চোখ রগড়ে পরিস্থিতি বুঝে ওঠার চেষ্টা করে, তারপর ব্যাপারটা ঠাওর করে ওঠে— নিশ্চয়ই কেউ গেটে ঢিল ছুড়েছে— কে কে বলে তারা দৌড়ে আসে গেটের বাইরে, দেখতে পায়,

ধ্যত, ঢিল কোথায়, এযে এক ফেরিওয়ালা, তার গলার স্বরই এমন ভয়ানক, ধাম্ ধাম্ করে গিয়ে লাগছে লোহার গেটে— ধর ব্যাটা ফেরিওয়ালাকে, ফাজলামোর জায়গা পায়না— তারা তিনজন তেড়ে আসে গল্পওয়ালার দিকে, ভাগ ভাগ, হতচ্ছাড়া কোথাকার; একজন দ্বাররক্ষী, যার বুক ভয়ে এখনো দুরুদুরু করে কাঁপছে, বুকের বোতাম খুলে একদলা থুতু সে ফেলে নিজের বুকেই, বেশি ক্ষিপ্ত, ছুটে গিয়ে জোরে ধাক্কা মারে গল্পওয়ালাকে। বেচারা গল্পওয়ালা। ভাঙা ফুটপাতে পড়ে যায়। আর দ্যাখো, তার হাত গিয়ে পড়ে হাতের ছায়ায়। পাড়ার সবগুলো কিশোর বালক, নিজ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পায়, আর ভাবে, ওই ছায়াই হলো লোকটার বেদনা, আর লোকটা তার কায়া-হাত দিয়ে তার ছায়া-হাতটাকে ধরলো, অর্থাৎ লোকটা তার বেদনাকেই স্পর্শ করলো।

লোকটা কিছুই বলে না, খানিকক্ষণ পড়ে থাকে পথের ওপর, তারপর উঠে দাঁড়ায়; আর ততোক্ষণে সদর দরজার সামনে একটা বড়ো কালো ফোরহুইল-ড্রাইভ গাড়ি এসে যায়, গাড়িটা বোধ করি বাড়ির মালিকের, তিন দ্বাররক্ষী দৌড় ধরে গেটের দিকে; গল্পওয়ালা তখন মাটিতে বসে পড়ে তার গল্পের ঝুলিটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। ভেতরে গরম গরম গল্প, তার উষ্ণতা গল্পওয়ালার শরীরের ভেতরে সঞ্চারিত হলে বুকের ভেতর হাহাকার ওঠে, তখন হঠাৎই একটা মেঘ এসে ঢেকে দেয় সূর্যকে, পুরোটা শহর হয়ে পড়ে ছায়ামগ্ন, নিজ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে— এ হলো গল্পওয়ালার বেদনা, ছড়িয়ে পড়েছে আকাশময়! ছেলেমেয়েদেরও মন খারাপ হয়, একটা ছোটো ছেলে, যার একটা পা নেই, নাম ডাব্লু, সে হাঁটে ক্রাচে ভর দিয়ে, কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে। গল্পওয়ালা বুঝি শুনতে পায় সে কান্নার শব্দ, উঠে বসে, ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ডাব্লুর দিকে, বলে, খোকা, কাঁদছো কেন, কাঁদতে নেই।

ডাব্লু, দু'বগলের নিচে দু'টো ক্রাচ, এক হাত চোখের কাছে নিতে চায়, তাকে মাথা নোয়াতে হয়, সে চোখের জল মোছে, আর বলে, কই, কাঁদছি না তো।

'উত্তম, উত্তম, কান্নার চেয়ে হাসিই উত্তম,'— গল্পওয়ালা বলে, 'তাহলে তুমি একটু হাসছো না কেন খোকা?'

'আমাকে খোকা বলছেন কেন?'

'বাহ! তুমি খোকা নও?'

'না! খোকা হলো একজন নেতার নাম।'

'তাহলে তোমার নাম কী?'

'আমার নাম ডাব্লু।'

'ডাব্লু তো একটা লেটারের নাম।'

'তা হোক। আমার নাম ডাব্লু। ডাব্লু মানে দু'টো ইউ। কিন্তু দেখুন আমার ইউ মাত্র দেড়খানা। একটা ইউ কাটা। জন্মের পর কী অসুখ হয়েছিল, কেটে ফেলতে হয়েছে।' নিজের কর্তিত পায়ের দিকে দেখিয়ে ডাব্লু বলে।

'তুমি এ নিয়ে মন খারাপ করো না ডাব্লু।'

'না। মন খারাপ করছি না। কেন করছি না, জানেন?

'না। কেন? বলো তো?'

'কারণ ডাক্তাররা আমার পা কেটে ফেলেছেন ভুল করে। পাটা না কাটলেও চলতো। পরে অন্য ডাক্তাররা বলেছেন।'

'হায়। হায়। তুমি কী বলছো ডাব্লু। আর বলতে হবে না।'

'আগে সবটা শুনুন। আমার তো কাটা পড়েছে মোটে একটা পা। আমার পাশের সিটের এক রোগীর অসুখ ছিল ডান পায়ের। ডাক্তাররা ভুল করে কেটে ফেলেছে বাম পা। পরে যখন হুঁশ হলো, তখন তারা তাড়াতাড়ি ডান পাটাও কেটে ফেললো। সে জন্যেই তো আমি মন খারাপ করছি না। এক পা কাটা পড়লে আপনি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবেন। কিন্তু দু'পা কাটা পড়লে আর উপায় নেই। আপনাকে চলতে হবে হুইল চেয়ারে।'

'অমন করে বলো না ডাব্লু।'

'আরে শুনুন না। আসুন আমরা ওই সিঁড়িটায় গিয়ে বসি। আসুন।' ডাব্লু আগে আগে একটা বিল্ডিঙের সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়ে। গল্পওয়ালাকেও তাই করতে হয়।

'তারপর যা বলছিলাম। দু'পা কাটা পড়লে আপনাকে চলতে হবে হুইল চেয়ারে। সেও খুব মজা। চলার নাম গাড়ি রে। কিন্তু এই হত ড়া শহরে হুইল চেয়ার নিয়ে আপনি কোথাও যেতে পারবেন না। আমি একবার দূর-পশ্চিম-দেশে গিয়েছিলাম। ওখানে হুইল চেয়ার নিয়ে সবখানে যাওয়া যায়, চড়া যায়। বাসগুলো বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বডিটা নিচে নামিয়ে ফেলে ফুটপাতের সমান হয়। তখন ফুটপাত থেকে হুইল চেয়ার গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে পড়ে বাসে। রেলওয়েও একই রকম। প্লাটফরম আর রেলের কামরার মেঝে একই তলে। আর আমাদের এ পচা শহরটাতে দেখুন, রাস্তায় যেখানে ওভারব্রিজ আছে, সেখানে দু'রাস্তার মাঝে ডিভাইডার, আর কাঁটাতার। বলুন, হুইল চেয়ারওয়ালা রাস্তা পারাপার করবে কী করে?'

'তাই তো?'

'সে জন্যেই বলছিলাম, আমি খুব লাকি। হবেই বা না কেন, আমার জন্মদিন

যে ৭ জুলাই। জুলাই নিজেও ৭। সবমিলে আমার মতো লাকি আর কে আছে, বলুন।'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়। নিশ্চয় তুমি একদিন অনেক বড়ো হবে। অনেক নাম করবে। আমি তোমার জন্যে অন্তর থেকে দোয়া করছি ডাব্লু।'

'থ্যাংক ইউ। তো আপনি কী বিক্রি করছেন? গল্পের বই?'

'না। গল্পের বই না। গল্প। গরম গরম গল্প। কাল সারারাত জেগে আমি বানিয়েছি। যত্ন করে সেঁকেছি। গরম গরম নিয়ে এসেছি। নেবে তুমি একটা?'

'কেমন দাম আপনার গল্পের?'

'নানা রকম গল্প আছে। একেকটার দাম একেক রকম।'

'কী রকম?'

'হাসির গল্প আছে তিন ধরনের। দাম? বিশ টাকা, ত্রিশ টাকা আর পঞ্চাশ টাকা। দুঃখের গল্প আছে দু'ধরনের। দাম একটু বেশি, ত্রিশ আর ষাট। আর আছে কতোগুলো সস্তা দরের গল্প। প্রতিটা দশটাকা।'

'তাহলে এখন আমি কোন গল্পটা কিনি বলেন তো।'

'তুমি। তুমিই বলো কোনটা কিনতে চাও। দামের জন্যে ভেবো না। তোমাকে আমি বিনি পয়সাতেই দেবো। ওটা হবে তোমার জন্যে আমার উপহার।'

'না না। বিনা পয়সাতে আমি কেন গল্প নেবো। তা হবে না।'

'না। তোমাকে এই গল্পটা নিতেই হবে। ভারি হাসির গল্প।'

'নেবো। কিন্তু আপনি দাম নেবেন।'

'না। দাম নেবো না।'

'দাম নেবেন না। যান। চলে যান এখান থেকে।' খুব রেগে-মেগে বলে ডাব্লু, রাগে তার চোখ-মুখ-কান লাল হয়ে যায়, ঠোঁট কাঁপতে থাকে, নিজের হাতের আঙুল নিজেই মটকাতে থাকে সে।

গল্পওয়ালা বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কী হলো। এই ছোট্ট ছেলেটা হঠাৎ রেগে গেলো কেন? কী ভুল করলো সে? সে হতভম্ব হয়ে বসে থাকে। উঠবে নাকি বসে থাকবে— একটা গল্প বের করে দেবে নাকি দেবে না— কিছুই বুঝতে পারে না। খানিক চুপ করে থাকার পর তার হুঁশ হয়, সে একটা সামান্য গল্পের ফেরিওয়ালা মাত্র, আর এ হলো একজন সম্ভাব্য খদ্দের— এই বাণিজ্যিক সম্পর্কটার অতিরিক্ত কোনো কিছু করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি— আর খদ্দের যে কতো রকম হয়; কতো বিচিত্র, যখন তুমি সেল্‌সম্যান, তখন তোমাকে যে কতো উদ্ভট পরিস্থিতিরই না মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু তুমি সেল্‌সম্যান, তোমাকে হাসতে হবে, শুধুই হেসে যেতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গল্পওয়ালা, বলে, যাই, মাথা নিচু করে গল্পের ঝোলাটা পিঠে তোলে সে, ডাব্লু বসেই আছে সিঁড়িতে, সে একটা ক্রাচ নাড়ছে হাত দিয়ে, যথারীতি মাটির দিকে চোখ।

গল্পওয়ালা খানিকদূর এগিয়ে গেলে ডাব্লু বলে, শুনুন। গল্পওয়ালা দাঁড়ায়, পেছন ফিরে তাকায়। ডাব্লু বলে, 'আপনি আমাকে দয়া দেখাতে চেয়েছেন। কেউ যদি আমাকে করুণা দেখাতে চায়, আমার খুব রাগ হয়। প্লিজ আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না। আমি কিছু মনে করিনি।'

'তাহলে আপনার একটা গল্প আমাকে বেচে যান।'

'ঠিক আছে। তুমি দাম দাও। আসলে আজ আমি প্রথম বেরিয়েছি তো। তুমিই আমার প্রথম ক্রেতা। বৌনি হচ্ছে তোমাকে দিয়েই। তাই একদম দাম না নিলে চলবে না। ঠিক আছে বলো, তুমি কিসের গল্প শুনতে চাও।'

'আপনি আসুন। বসুন। গল্প বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেনা যায়।'

গল্পওয়ালা ফের আসে। সিঁড়িতে বসে। এটা একটা সরকারি অফিস ভবন। আজ ছুটির দিন। তাই সব দরজা-জানালা বন্ধ। সিঁড়িটা নোংরা, তবে ফাঁকা। বসা যাচ্ছে। এখানে ওখানে সিগারেটের টুকরা ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে। দেওয়ালে নানান দাগ। আর পোস্টার। পোস্টার তুলে ফেলার পর ভয়াবহ অবশেষাংশ লেপ্টে আছে দেওয়ালে। আর আছে নানা দেওয়াল লিখন। একটা লিখন এমন— দেশকে বানাইল জুয়ারি, চালু করিয়া লটারি। এটা আগের সরকারের আমলে লেখা। এটা লিখেছে বর্তমান সরকারি দলের কর্মীরা। এরপর সরকার বদল ঘটেছে। যারা বিরোধীদলে ছিল, তারা এখন সরকারির দলে পরিণত। এখনো লটারি চলছে পুরোদমে। কিন্তু দেওয়াল লিখনটা আর মোছা হয়নি।

'তাহলে তোমাকে কোন গল্প শোনাবো। হাসির গল্প, নাকি কান্নার?'

'আপনার ঝুলিতে হাত দিন। যেটা আগে উঠবে, সেটাই কিনবো আমি। টাকা নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমার একটা মানি ব্যাগ আছে। সেটায় অনেক টাকা জমে আছে। আমার জন্যে রোজ পঞ্চাশ টাকা করে বরাদ্দ কিন্তু আমার তো এতো টাকা খরচ হয় না।'

'আচ্ছা। দেখা যাক। তোমার ভাগ্যে কোন গল্পটা আছে।' গল্পওয়ালা তার গল্পের ঝোলার মুখের বাঁধনটায় হাত দেয়। তারপর চোখ বন্ধ করে তোলে একটা গল্প। সেই গল্পটা সে বের করে। একটা ছোট্ট ভাপা পিঠার সমান গল্প, গরম। উম্‌ম্‌। এটা হলো মাখনরাণীর গল্প। তুমি কি এটা নিতে চাও?'

'হ্যাঁ। আমি তো বলেইছি, যেটা সবার আগে উঠবে, সেটাই আমি নেবো। এটার দাম কতো?'

'এটা একটা সস্তা গল্প। এর দাম মাত্র ৫ টাকা।'

'না। আপনি ইচ্ছে করে দাম কমাচ্ছেন।'

'না না। তা কেন? আমি তো বলেছিই, তুমি হলে আমার প্রথম খদ্দের। এটা হলো আমার বৌনির সময়। এ সময় আমি নিজেকে ঠকাবো না।'

'আচ্ছা। মানলাম। দিন দেখি তাহলে আপনার গল্প।'

গল্পটা ডাব্লু তার হাতে নেয়। সত্যি ভাপা পিঠার আকৃতি একটা জিনিস। মধ্যখানে একটা সুতো ঝুলে আছে, বোঁটার মতো। গল্পওয়ালা বলে, ওই সুতো ধরে একবার টান দিলে গল্প আরম্ভ হয়ে যাবে, আর দুবার টান দিলে গল্প হয়ে যাবে শেষ। বুঝলে ডাব্লু, এই সুতো কিন্তু যে সে সুতো নয়। একেবারে নটে গাছের তন্তু দিয়ে তৈরি। সুতো মুড়োলেই তাই গল্পের শেষ।

ডাব্লু মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুতো ধরে দেয় একটান। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় গল্প। মাখনরানীর গল্প।

মৌমাছির মতো গল্পের একেকটি শব্দ একেকটি বাক্য ঘুরছে উড়ছে ডাব্লুর মাথার ওপরে, আর একটার পর একটা লাইন ঢুকে যাচ্ছে তার কর্ণকুহরে।

মাখনরানীর গল্প

একদেশে ছিল এক রানী। নাম তার মাখনরানী। তিনি সারাক্ষণ শুধু মাখন খেতেন। সকালের নাস্তায় তার চাই মাখন, দুপুরের খাওয়ায় চাই মাখন, এমনকি রাতের খাবারেও তার থাকতো প্রচুর পরিমাণে মাখন। গালে তিনি সারাক্ষণ মাখতেন ক্রিম। ওতো মাখনই। হাতে পায়েও তার মাখতে হতো মাখন। আসলে যা মাখতে হয় তাই তো মাখন, যেমন যা চাখতে হয় তাই চাখন। আর তার সঙ্গে যদি কেউ কথা বলতো, তবে তাদের ভাষাও হতো মাখনের মতো নরম আর বিগলিত। যেন তার পাত্র মিত্র অমাত্যেরা সারাক্ষণ তার পদদ্বয়ে মাখছে উত্তম স্নেহ-জাতীয় পদার্থ।

আর মাখন খেয়ে মাখন মেখে মাখনরানীর মাথাটা গেলো বিগড়ে। তিনি ঘোষণা করলেন, আজ থেকে সবার জন্যে চাই মাখন-ভাত। গরীব প্রজারাও দু'বেলা মাখন ভাত খাবে, এই আমার নির্দেশ।

মাখনরানীর ছিল ননীমন্ত্রী। তারা বললো, আজ্ঞে জগতশ্রেষ্ঠা মহামানবী, লোকে দু'বেলা ভাত পায় না। তারা মাখন খাবে কী করে। শুনে মহামানবীর হৃদয়টা একেবারে মাখনের মতো গেলো গলে। তিনি হাপুস-হুপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন।

সে কি, আমার রাজ্যের মানুষ দু'বেলা পেট পুরে ভাত খেতে পায় না। তাহলে ওদের বলো, যেন মাখন দিয়ে রুটি খায়।

শুনে মন্ত্রীসভা ধন্য ধন্য করে উঠলো।

তারপর রাজ্যে পিটিয়ে দেওয়া হলো ঢেঁড়া, আজ থেকে রাজ্যের সব প্রজাকে খেতে হবে দু'বেলা মাখনরুটি, মাখনরানীর নির্দেশ। যদি কেউ না খায়, তবে তার গর্দান যাবে।

শুনে তো প্রজাদের চক্ষু চড়কগাছ। এ কোন আজব খেয়াল হয়েছে বিবির।

কিন্তু এ হলো মাখনরানীর ঘোষণা। তিনি হলেন এক কথার মানুষ। তার হুকুম মানেই নট নড়ন নট চড়ন। ঘোষণা জারি হওয়ার পরদিন থেকেই তা কার্যকর করা হবে— এই ভয়ে ফেটে গেলো সবগুলো মাটির কুটির। তখন মন্ত্রীরা, সবাই গিয়ে পড়লো রানীর পায়ে, মহামানবী, আপনার দয়ার শরীর, মাখনহৃদয়, সতেরো দিন সময় দিন, যেন রাজ্যে পর্যাপ্ত মাখন তৈরি হয়, আর ঘরে ঘরে পর্যাপ্ত মাখন পৌছে যেতে পারে।

মাখনরানী মিটমিট করে হাসলো। আমার রাজ্যে কি প্রচুর মাখন উৎপন্ন হয় না?

'নিশ্চয়। নিশ্চয়। তবে সবার ঘরে ঘরে মাখন পৌছানো চাই তো।'

'সবার ঘরে ঘরে মাখন পৌছাতে হলে কী করতে হবে?'

'দেশের গরুগুলোকে মোটা-তাজা করতে হবে।'

'ঠিক আছে। তাহলে একটা প্রকল্প হাতে নেওয়া হোক। গরু মোটা-তাজাকরণ প্রকল্প।'

'তথাস্তু। সতেরো দিনের মধ্যে সব গরু যেন মোটা তাজা হয়, তারা যেন প্রচুর দুধ দেয়, তাদের দুধে যেন প্রচুর ননী থাকে, দেশে যেন প্রচুর মাখন উৎপাদিত হয়।'

'জো হুকুম মহামানবী।'

ব্যাস। শুরু হয়ে গেলো সব গরুর জন্যে দূর্বাঘাস কর্মসূচী। সতেরো দিন ধরে চললো গরুর সেবা-যত্ন। তারপর শুরু হলো গরুর পায়ে ধরে সাধা।

'দেশে কি প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপাদিত হচ্ছে?'

ননী মন্ত্রী বললো, 'জী মহামানবী। হচ্ছে। তবে...'

'তবে..., তবে কিসের। কোনো হবে-টবে নয়। কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়।'

'একটা ছোট্ট সমস্যা যে হয়েছে মহামানবী।'

'কী ছোট্টো সমস্যা?'

'দেশের গাইগুলো প্রচুর পরিমাণে দূর্বাঘাস পায়নি।'

'কেন পায়নি।'

'পায়নি, কারণ গো-সংখ্যা বিস্ফোরণ। আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন, দুধ দেয় গাভীগণ, বলদ বা ষাঁড়গণ নয়। অথচ সবার জন্যে দূর্বাঘাস কর্মসূচীতে গাভী বলদ নির্বিশেষে সব গরুই ঘাস পেয়েছে। এর ফলে একেকটি গাইয়ের বখরা কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। তাই নয় কি?'

'তাই তো। তাই তো। তা হলে উপায়।'

'চাই গো-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব। গরুদের জন্যে কি পর্যাপ্ত সংখ্যক মায়াবড়ি আমদানি করতে হবে?'

'তা করা যায়। তাতে শুধু যে বলদের সংখ্যা হ্রাস পাবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। গাভীর সংখ্যাও কমে যেতে পারে।'

'তাহলে উপায়।'

'উপায় আছে মহামানবী। বলদ বা ষাঁড় বধ কর্মসূচী। সাধুভাষায় বৃষ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী। সারা দেশে খুঁজে খুঁজে সব বলদ ষাঁড় এঁড়ে জবাই করে ফেলতে হবে। বেঁচে থাকবে শুধু গাই আর গাই।'

'বাহ্বা। বাহ্বা।'

'এতে, হে মহামানবী, দুটো লাভ হবে। আমাদের গাইগুলো হবে মোটাতাজা। আর আমাদের লোকসকল হবে আমিষের সংকট থেকেও মুক্ত।'

'বাহ্বা। বাহ্বা।'

এরপর আবার অনুষ্ঠান। সংবাদপত্রে বেরুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র। জাতীয় বৃষ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন। উদ্বোধন করবেন মাননীয় মাখনরানী।

দিন যায়। দেশের সব বৃষ খেয়ে-দেয়ে সাফ। থাকে শুধু গাই। তখন, মাখনরানীর মনে পড়ে যায় তার ঘোষণার কথা— সবার জন্যে মাখনরুটি।

'ননীমন্ত্রী,' তিনি ডেকে বলেন, 'আমার মাখনরুটি কর্মসূচীর কী হলো। সবাই দু'বেলা মাখনরুটি খাচ্ছে তো।'

'আজ্ঞে খাচ্ছে।'

'তাহলে নামিয়ে দাও সান্ত্রীদের পথে পথে। যে একবেলা মাখনরুটি খাবে না, তার গর্দান যাবে।'

'গর্দান যাবে, গর্দান যাবে।'

যে কথা, সেই কাজ। লোকালয়ে নেমে এলো সান্ত্রীর পাল। তারা রাত

বিরাতে হানা দেয় প্রজাদের ঘরে। 'এই, তোরা মাখন রুটি খাচ্ছিস তো।'

'আজ্ঞে খাচ্ছি।'

'দেখি। আনতো রুটি মাখন।'

'আজ্ঞে। এখন তো নেই। রাতেরটা রাতে খেয়ে ফেলেছি। কালকেরটা কাল যোগাড় হবে।'

'না। তাহলে তো হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। কাল সকাল পর্যন্ত আমরা রইলাম পাহারায়। দেখি, তোরা কী খাস?'

তখন প্রজা কেঁদে কেটে পায়ে পড়ে সান্ত্রীদের। 'হুজুর মা বাপ, দেশে একটাও বলদ নেই। বলদ না হলে হাল চাষও নেই। হালচাষ নেই বলে এক দানা গমও হয়নি, একদানা ধানও হয়নি, না খেয়ে আছি হুজুর। কচু-ঘেচু খাচ্ছি। কলার থোর সেদ্ধ খাচ্ছি। মধুয়া নামের যে ঘাস, তার গোড়া চিবিয়ে খাচ্ছি। মাখনরুটি পাবো কই?'

'হুম। তাহলে তো তোদের গর্দান নিতেই হয়।'

'হুজুর। ক্ষমা করে দিন হুজুর।'

'ক্ষমা। ক্ষমা তো করা যাবে না। তার বদলে তোদের জরিমানা হবে। দে, জরিমানা দে। শ'দুয়েক টাকা ছাড়।'

'টাকা। টাকা কোথায় পাবো হুজুর। গরিব মানুষ। না খেয়ে না দেয়ে আছি।'

'আচ্ছা। তাহলে তোদের ঘর তল্লাসি করে দেখি।'

এরপর সান্ত্রীরা নামে তল্লাসিতে। ঘরদোর উথালপাথাল লন্ডভন্ড করে যা পায়, তাই তারা আত্মসাৎ করে। গরিব প্রজার দু'টো কাঁসার বদনা কি পিতলের কলস, শখের পুতুল কিংবা বৌয়ের নাকফুল— যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে যায় তারা। যারা দিতে চায় না, তাদের ওপর চলে জুলুম অত্যাচার।

এমনি করে যায় দিন। একটা মানুষেরও গর্দান নেওয়া হয়নি। মাখনরানী আহ্লাদে আটখানা। তার রাজ্যের সবাই দু'বেলা মাখন-রুটি খেতে পাচ্ছে। কী মজা। কী আনন্দ।

আনন্দে তিনি বেশি করে ঘুমুতে থাকেন। সকাল বেলা ঘুমোন। দুপুরবেলা ঘুমোন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একেবারে তুলতুলে মাখনটি হয়ে ওঠেন।

কিন্তু প্রজাদের অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন। খেতে ফসল নেই। গোয়ালে বলদ নেই। ষাঁড় না থাকলে গাইগুলো গাভীনই বা হবে কী করে। দুধই বা দেবে কী করে। তার ওপর চারদিকে সৈন্যদের অত্যাচার। ঘরে চাল বাড়ন্ত। হাঁড়ি শিকেয়। মানুষ

মারা যাচ্ছে না খেয়ে না দেয়ে। সে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা।

ক্ষুধার্ত শিশু কাঁদছে— মা একটু খাবার দাও। মা খাবার কোথায় পাবেন। একটুকরো খাবার পেলে তো তিনি নিজেই খেয়ে ফেলবেন।

রাজ্যের মানুষ তখন সবাই গেলো খেপে। মাখনরানীকে উৎখাত করো।

উৎখাত উৎখাত

মাখনরানীকে উৎখাত

মাখন-রুটি চাই না

চাই এবার দুধভাত

কিন্তু কী করে মাখনরানীকে জব্দ করা যায়। প্রজারা রব তুললো— জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো।

প্রজারা করলো কী, একজোট হয়ে নেমে পড়লো রাজপথে আর জ্বালাতে লাগলো আগুন। আগুন জ্বলে উঠলো মাখনরানীর রাজপ্রসাদের চারদিক। চারদিক গরম। মহাগরম। এতো গরমে মাখনরানী কি তিষ্ঠোতে পারে। মাখন গলতে লাগলো। গলে গেলো মাখনরানীর শরীর। আর তাতেই মাখনরানী মিলিয়ে গেলো একেবারে।

গল্প শেষ হলো।

মৌমাছির মতো গুন গুন করতে করতে গল্পের একেকটা শব্দ একেকটা বাক্য ঢুকে যায় ডাব্লুর কানের ভেতরে।

ডাব্লু এতোক্ষণ গল্প শুনছিল মন দিয়ে। সব কিছু ভুলে। গল্প শেষ হতেই আওয়াজ ওঠে কুঁ-উ-উ করে। তাড়াতাড়ি সুতোয় দু'টো টান দিয়ে গল্প নামিয়ে দেয় সে।

তারপর একটা বড়ো শ্বাস ফেলে দম নেয়।

'কেমন লাগলো গল্পটা। পাঁচ টাকার গল্প তো। একটু সস্তা ধরনের।'

'ভালো। খুবই ভালো।' ডাব্লু বলে। ডাব্লু তার পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে। পাঁচ টাকার একটা নোট সে দেয় গল্পওয়ালার হাতে। গল্পওয়ালা টাকায় চুমু দেয়। তারপর খুব যত্ন করে ভাঁজ করে রেখে দেয় বুক পকেটে। তার ভীষণ আনন্দ হয়, ভীষণ। আজ তার একটা গল্প বিক্রি হয়েছে। একজন ক্রেতা তার বানানো গল্পের প্রশংসা করেছে। আনন্দের আতিশয্যে তার চোখে পানি এসে যায়। সে বুঝতে পারে না— ডাব্লুকে সে ধন্যবাদ দেবে কী ভাষায়।

পাঁচ পাঁচটি টাকা পকেটে। গল্পওয়ালা ফেরে। হেঁটে হেঁটে শহরের শেষ মাথা পেরিয়ে, একটা হেডিংবন্ড রাস্তা ধরে— আশে পাশে নতুন নতুন বাসা উঠছে, তবু জায়গাটা এখনো ঠিক মনুষ্য বাসোপযোগী হয়ে ওঠেনি, আর রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী নিয়ে খুব ট্রাক চলাচল করে বলে রাস্তাটা এবড়ো-থেবড়ো, আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপ, নাকি চাঁদের পিঠ যেটা নভোচারীদের পদতলে পড়েছিল, বড়ো খানা খন্দক— এই ফাল্গুনে লোকটা বাড়ি ফিরছে। হেঁটে হেঁটে। পকেটে পাঁচটি টাকা। একটা কড়কড়ে নোট। সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। বইতে থাকে বসন্তের বিখ্যাত বাতাস— শ্রী সমীরণ। মৃদুমন্দ। পেছনের রাজপথে গাড়ি চলছে সার বেঁধে, হেডলাইট জ্বালিয়ে, শহররক্ষা বাঁধটা পেরুনোর পর সামনের দিগন্তে ছাড়া ছাড়া বিল্ডিং, তাতে বাতি, আর কালোগাছগুলির সারি, তার ওপরে সান্ধ্য আকাশে ফাল্গুনের রাগ।

জীবনের প্রথম গল্পবিক্রির এই মুহূর্তটি যেন এই প্রদোষমুহূর্তটির মতোই— আলো আর আঁধারিতে মেশানো, শহর আর উপশহরের সন্ধিস্থল, নীল আকাশে কালো আর লালের মাখামাখিতে সাজানো।

সে যখন গল্পগুলো বানায়, তখন তার ছিল কেবল বানানোরই নেশা, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে একের পর এক গল্পের শরীর যে গড়ে তুলেছে। সেই বানানোর প্রক্রিয়ায় সে কোনো খাদ রাখেনি, ফাঁকি দেয়নি। এই গল্পগুলো যে ঠিক বিক্রি হবে— এটা তার মাথায় কাজ করেনি। কিন্তু বানানো হয়ে গেলে যখন প্যাকেটে পুরতে হয়েছে, তখন তার কাছে সৃষ্টিটা আর মুখ্য ছিল না, তখন সে এক হিসেবি বেনিয়া, কীভাবে প্যাকেট করলে বিক্রি বেশি হবে, কোন গল্পটার দাম রাখতে হবে কতো— এসবও তার মনের মধ্যে ক্রিয়া করেছে।

এখন সত্যি সত্যি যখন তার একটা গল্প বিক্রি হয়ে গেলো, আর চোখের সামনেই একজন ক্রেতা সেটা গ্রহণ করলো, সেবন করলো— তার যেন কেমন লাগে। প্রথম ঝলকে যে খুশির বাতাস মনের মধ্যে ফাল্গুনের সমীরণের মতোই বয়ে গিয়েছিল, এখন সেটা কিছুটা গতি হারায়, মন্থর হয়ে পড়ে। কেন, সে বুঝতে পারে না।

তবে এই পাঁচটি টাকা উপার্জনের এই উপলক্ষটি সে কীভাবে উদযাপন করবে! সে পাড়ার মুদির দোকানে যায়। এ দোকানে আছে তার বাকির খাতা। দোকানি তাকে দেখলেই খোটা দেবে, তাগাদা দেবে, বলবে বকেয়া টাকা শোধ না হইলে নয়া বাকি দেওন যাইব না। কিন্তু এখন তো তার কাছে অন্তত পাঁচটি টাকা আছে। এই পাঁচ টাকা দিয়ে নগদ নগদ একটা কিছু কেনা যায় না?

কী কেনা যায়! পাঁচটাকায় কি আর কিছু হয়! তার বদলে থাকুক না তার প্রথম গল্প বিক্রির টাকাটা তার সংগ্রহে। সে বরং বাকিতেই একটা কিছু কিনুক। দোকানের সামনে গিয়ে সে দাঁড়ায়। দোকানির ভুরু কুচঁকে ওঠে। সে বলে, সানঝের সময় বাকি দেওন যাইব না। আগে বউনি কইরা লই, তারপর। আপনে একটু সইরা খাড়ান।

গল্পওয়ালার অন্তরটা কেমন চুপসে যায়। এই লোকটা তাকে যে ঘাড় ধরে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে না, তার একটা কারণ আছে। প্রতিমাসে সে বউকে একটা করে চিঠি লেখে। তার বউ থাকে গ্রামে। লোকটা নিজে লিখতে জানে না। গল্পওয়ালা তার হয়ে চিঠি লিখে দেয়। দোকানি লোকটা বলে যেতে থাকে, গল্পওয়ালা শুনে শুনে লেখে। কিন্তু লেখার সময় সে পুরো ব্যাপারটাকে পরিশীলিত করে দেয়। যেমন দোকানদার বলে, স্নেহের স্ত্রী কুলসুম, পাকজনাবেষু। আর গল্পওয়ালা লেখার সময় লেখে— প্রিয় কুসুম, কেমন আছো।

দোকানি অবশ্য খুব আশায় আশায় থাকে, তার বউ চিঠির জবাব দেবে। তখন গল্পওয়ালাকে সেই চিঠি পড়ে শোনাতে হবে। কিন্তু তার বউ কোনোদিনই চিঠি লেখে না। দোকানি বলে, আসলে কুলসুম খুব চালাক-চতুর আলেম মহিলা, চায় না, তার মনের কথা অন্যে জানুক। নিজে চিঠি লিখিতে পারলে নিশ্চয় লেখতো। কাউরে দিয়া লেখায়া লওনের মানুষ হে না।

এখন এই মুদি দোকানিও তাকে দোকান থেকে সরে দাঁড়াতে বলে। এতো বড়ো স্পর্ধা।

গল্পওয়ালা বলে, দুইটা লজেন্স দাও। আর দাও... আর দাও... ঠিক কী নেওয়া যায়, সে সিদ্ধান্ত করতে পারে না।

'কইলাম তো অহন বাকি দেওন যাইব না।'

'বাকি নেবো না বাকের মিয়াঁ। নগদ টাকা আছে পাঁচটা। দু'টো লজেন্স কেনার পর কতো থাকে। তাই দিয়ে একটা ভালো কিছু দাও দেখি। আচ্ছা মিষ্টি জাতীয় কী আছে?'

'গুড় আছে, আর চিনি আছে।'

'ওই লাড্ডুগুলো কতো করে?'

'একটা একটাকা। দিমু।'

'দাও। চারটা দাও দিকিনি।'

পাঁচ টাকার সওদা কিনে খুশি মনে গল্পওয়ালা যায় তার বাড়িতে। একটা ছোট্ট টিনের ঘর। শহরের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গরিবগ্রাম্য বাসা। বলা যায়,

বস্তির চালার চেয়ে কিছুটা উন্নত। কিন্তু গরিবির চিহ্নও প্রকট।

বারান্দায় বাতি নেই। পিচপিচে অন্ধকার। কিটকিট করে কী একটা সান্ধ্যকীট ডাকছে। দরজার কবাট ভেজানো ছিল। 'কই গো কোথায় গেলে' বলে গল্পওয়ালা কবাটে চাপ দেয়। কবাট খুলে যায়। ভেতরে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব ততোধিক অল্প ভোল্টেজে খুব ম্লানভাবে জ্বলছে। কতোগুলো আলোর পোকা উড়ছে তাকে ঘিরে।

একটা ছোট্ট খোকা, গল্পওয়ালার ছেলে, বয়স তিনবছর, নাম সাধন, দৌড়ে আসে। 'বাবা, আসছে, বাবা, আসছে।'

'সাধন, বলো তো তোমার জন্যে কী এনেছি?'

'কী এনেছো বাবা।'

'এই যে। এই নাও। লজেন্স।'

লজেন্স হাতে পেয়ে সাধন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। হাফ প্যান্ট, অনেক নিচে নেমে গেছে, পেছন দিকে থেকে নিতম্ব জোড়ের কাটা দাগ দেখা যায়, সে দিকে তাকিয়ে গল্পওয়ালা হাসে।

'কই গো। কোথায় গেলে?' গল্পওয়ালা আরেকবার হাঁক দেয়।

তখন, তাদের বিছানা থেকে শব্দ আসে, 'ক্যানো, কী হয়েছে, দুনিয়া মাথায় করে বয়ে এনেছো নাকি?' এই আওয়াজ শ্বাসাঘাত আর ক্লান্তিতে বেশ মরা মরা শোনায়। গল্পওয়ালার হুঁশ হয় যে, সাধনের মা'র শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। এই অবেলায় তাকে বিছানায় আশ্রয় নিতে হয়েছে কি আর এম্নি এম্নি।

সাধন, তার টলমলে পা, কিন্তু তাতে খুশির বেগ, সে লাফাচ্ছে তিড়িং বিড়িং, দৌড়ে যায় মায়ের বিছানার কাছে, মা, মামণি, বাবা আমার জন্য লজেন্স এনেছে।

'ভালো করেছে'— রোগা মুখে ভাবান্তর না ঘটিয়ে সাধনের মা রেবা উত্তর দেয়।

'শোনো, আজ ভারি আনন্দের দিন। আজ আমার একটা গল্প বিক্রি হয়েছে। এটাকে বিক্রি বললে ঠিক জিনিসটা বোঝানো যাচ্ছে না, আসলে প্রকাশিত হয়েছে। একটা গল্প গো। যে গল্পটা নিয়েছে, তার ভারি পছন্দ হয়েছে গল্পটা— বুঝলে।'

'তাই বুঝি।' রেবার ম্লানমুখেও একটুখানি হাসির আভাস। দেখে বড়ো ভালো লাগে গল্পওয়ালার। উৎসাহ পেয়ে বলে, 'পাঁচটা টাকা নগদ পেলাম। এতো বড়ো একটা আনন্দের ঘটনা। কিন্তু দুনিয়ার লোককে ঠিক বলে বোঝানোও যাবে না। সবাই ভাববে— সামান্য পাঁচটা টাকা পেয়ে এ লোক অমন করছে কেন। এ এক ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপার। এই গল্প বানানো আর অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার

ব্যাপারটা। তুমি যে বুঝতে পেরেছো, দেখে আমার খুব ভালো লাগছে সাধনের মা।'

গল্পওয়ালা তার গল্পের ঝোলাটা যত্ন করে রাখে টেবিলের ওপর, তারপর লাড্ডুর ছোট্ট প্যাকেটটা খুলে লাড্ডুগুলো বের করে সাধনকে ডাকে, 'বাবা সাধন, এদিকে আসেন তো দেখি।'

'জি বাবা।' সাধন দৌড়ে আসে।

'চোখ বন্ধ করেন। মুখ হা।' একটা লাড্ডু ছেলের মুখে পুরে দেয় বাবা। এক টাকা দামের সস্তা লাড্ডু, তেমন বড়ো কিছু নয়, তবু সাধনের ছোট্ট মুখে ঢুকে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, সে কী করবে বুঝতে পারে না, রেবা 'করো কী, করো কী' করে উঠে পড়ে সাধনের মুখের সামনে নিজের হাত পেতে বলে, ফ্যাল ফ্যাল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবি তো।

সাধন মায়ের হাতে লাড্ডুটা ফেলে আবার হাত থেকে ভেঙে ভেঙে তুলে খায়।

'এবার তুমি চোখ বন্ধ করো।' রেবাকে বলে গল্পওয়ালা। রেবা বলে, 'নাহ্ এই সন্ধ্যাবেলায় আমার মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'ঠিক আছে। মিষ্টি খেতে হবে না। তোমাকে ঝাল খাওয়াবো।'

'ঝাল। আর কি এনেছো?'

চোখ বন্ধ করে হা করো। রেবা স্বামীর আদেশ মান্য করলে গল্পওয়ালা তার খোলা মুখে নিজের অধর পুরে দেয়।

সাধন চিৎকার করে ওঠে, মা, খেয়ো না, ঝাল, ঝাল।

'কী করো। ছেলে বড়ো হয়েছে না'— কপট রাগে বলে রেবা। 'হাত মুখ ধুয়ে নাও। নাকি গোসল সেরে নেবে। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরেছো। কিছু নিশ্চয় পেটেও পড়েনি। এখন তোমাকে কী খেতে দিই।'

'না। ব্যাকুল হতে হবে না। তোমার মাথাব্যথাটা কি একটু কমেছে?'

'না। ব্যথা-বেদনার যন্ত্রণায় শেষ হয়ে গেলাম। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। হ্যাগো, তোমার পাঁচটাকায় একপোয়া চাল আর দুটো আলু তো পাওয়া যাবে। যাও, নগদ টাকায় কিনে নিয়ে এসো। তারপর একবারে কাপড়চোপড় ছাড়ো।'

'আচ্ছা। কিন্তু নগদ টাকায় তো আর চাল-ডাল আনার জো নেই। টাকা দিয়ে লজেন্স লাড্ডু কিনে আনলাম না।'

রেবা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই লোকটা কে? এই লোকটা কী? সংসারের কোনো ব্যাপারই কি সে কোনোদিন বুঝে উঠবে না। ঘরে চাল বাড়ন্ত, আর সে কিনা

হাবিজাবি জিনিস কিনে নগদ টাকাটা নষ্ট করলো। বড়ো অভিমান হয় রেবার, সে ঝপ করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। বউয়ের হঠাৎ কী হলো, বুঝতে পারে না গল্পওয়ালা। সে চুপ করে বসে থাকে বিছানায়।

'বাবা বাবা'— সাধন বাবার পা ধরে ঝুলোঝুলি করে। বাবার কানে সে-কথা ঢোকে না।

'তোমার মাথাব্যথাটা বুঝি বেড়ে গেছে। দাও, একটু মাথা টিপে দিই'— গল্পওয়ালা হাত বাড়ায় বউয়ের কপালের দিকে।

'যাও'— রেবা হাত সরিয়ে দেয়, ঝামটা মারে।

'ভারি মুশকিল হলো তো'— অসহায় ভঙ্গিতে বলে গল্পওয়ালা।

'আজ আর চুলায় হাঁড়ি উঠছে না। রান্নাবান্না বন্ধ। কালই আমি সাধনকে নিয়ে চলে যাবো বাপের বাড়িতে। থাকো তুমি পড়ে তোমার গল্প-টল্প নিয়ে। সংসার বলতে যে একটা জিনিস আছে, সেটা কী করে চলে, তুমি কোনোদিনই বুঝতে চাইলে না।' রেবার কণ্ঠ প্রথমে ঝাঁঝালো, পরে তাতে যোগ হয় কান্না। গর্জন পরিণত হয় বর্ষণে।

গল্পওয়ালা বেরোয় দোকানের পথে। এখন তো নিশ্চয় সন্ধ্যার বৌনি হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় বাকিতে বেচতে দোকানদারের কোনো অসুবিধা হবে না।

বাকিতে চাল-ডাল-আলু-হলুদ-নুন-পেঁয়াজ পেতে এবারো অসুবিধা হয় না, যদিও, গল্পওয়ালা লোকটা, দোকানদারের সামনে দাঁড়িয়ে এসব চাওয়ার আগে, পথে যেতে যেতেই, তিনবার রিহার্সাল করে নিয়েছিল যে, বলবে, দ্যাখো বাকের মিয়া, আর দুটো দিন। মাত্র আর দু'টো দিন। এরপর আর বাকি-টাকি চাইবো না। সব নগদ টাকায় কেনা-বেচা চলবে। ভীষণ ব্যস্ততা যাচ্ছে তো। গল্প যা বিক্রি হচ্ছে। তখন কিন্তু ভাই, তোমার বউয়ের চিঠি লেখার সময়ও আর করে উঠতে পারবো না। কিন্তু দোকানে গিয়ে এই কথাটাই বলা হয় না। সন্ধ্যার পর এই সময়ে দোকানে খদ্দের নেই তেমন। শুধু, কোনো এক বাড়ি থেকে একটা চৌদ্দ-পনের বছরের কাজের মেয়ে এসে জুটেছে, সে বোধহয়, খানিকটা নারকেল তেল বিনিপয়সায় নিতে চাইছে এক্ষুণি মাথায় মাখবে বলে; তাই দোকানির সঙ্গে তার ঢলোঢলো আচরণ, তার দিকেই দোকানির যতো মনোযোগ, গল্পওয়ালাকে সে পাত্তাই দিচ্ছে না। আর মেয়েটির সঙ্গে দোকানির চোখে চোখে যেন কী কথা হচ্ছে, তাদের প্রাইভেট ব্যাপারের মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকতে গল্পওয়ালার লজ্জা লাগছে বলে সে একটু দূরত্ব বজায় রাখে; দোকানি বলে, রাইতে কই শুইতে দ্যায় তোমায়, বিছানায়, না ফোলোরে। মাটিতে শোতো?

'মাটিতে ক্যান শুমু। মাইঝা পাকা না? বিছনা আছে না?'

'ও, তাও একটা সম্মানের ব্যাপার আছে। হেরা থাকবো চকিতে খাটে পালঙ্কে, তুমি থাকো নিচে।'

'আমি কি ভাইজানের বউ লাগি যে আমারে তার বিছানায় লইবো।'

'তাও তো কথা। তা তুমি একলা শুইয়া থাকো। একলা একলা ভয় লাগে না?'

'ভয়! কী কয় মরদে।'

'কোন্ কাইত হইয়া ঘুমাও। চিত হইয়া না উপুড় হইয়া?'

'ঠিক নাই। ডাইন কাইত। বাম কাইত। অ্যাতো কথার কাম কী। ত্যাল দিবা নি।'

'দিমু তো। মাথায় মাইখা দিমু।'

গল্পওয়ালা গলা খাকারি দেয়। এর অর্থ— আমাকে বিদেয় করো। তারপর এর মাথায় তেল মেখে দাও না বাবা যতো খুশি। তাই হয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত কাস্টোমারকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য দোকানি ডাকে। ভাইজান কন তো আপনার কী! যন্ত্রণা!

মাথাব্যথা নিয়েই রেবা যায় রান্নাঘরে। ঘরের সঙ্গে একটা চালা, বারান্দা কাম রান্নাঘর। কেরোসিনের চুলা। রেবা চাল তুলে দেয় হাঁড়িতে।

সাধন বাবাকে পেয়ে বসে। বাবা, ঘোড়া ঘোড়া খেলবো। খেলো। বাবাকে ঘোড়া হতে হয়। সাধন পিঠে চড়ে বসে। বাবা ছেলেকে পিঠে নিয়ে হামাগুড়ি দেয়। ছেলেটাকে সে বড়োই ভালোবাসে। ভালোবেসেই সে ছেলের নাম রেখেছে সাধন। সময় গেলে সাধন হবে না। একটু মারফতি লাইনে এই নামকরণ।

তারপর রাত বাড়লে, খাওয়া-দাওয়া সেরে, মায়ে-পুতে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন, একা জেগে থেকে, শুরু হয় গল্পওয়ালার গল্প-সাধন। আজ তার ঝোলায় প্রায় সবগুলো গল্পই অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে। এই গল্পগুলোকে সে বের করে। ভাপা পিঠার মতো আকারের একেকটা গল্প। একটা সুতো প্রতিটার সঙ্গে। সেই সুতোয় একবার টানলে গল্প শুরু হয়, দুবার টানলে গল্পের সমাপ্তি। বারান্দায় চুলোয় গিয়ে সে গল্পগুলোকে আবার গরম করে।

আজ আর বেশি গল্প বানাতে হবে না। একটা কৌটায় আছে কাহিনী, একটা কৌটায় শব্দ, একটা কৌটায় চরিত্র, একটা কৌটায় পারম্পর্য, একটা কৌটায় স্থান-কাল, আর কতোগুলো কৌটায় নানা গরম মশলা— আবেগ, কৌতুক, সেক্স...। এসব কিছু তাকে মেলাতে হয়। ইচ্ছে মতো মেলালেই তো হলো না। এ হলো সাধনার ব্যাপার। সময় গেলে সাধন হবে না।

আজ সে একটা নতুন গল্প বানায়। সারারাত পার হয়ে যায় একটা মাত্র গল্প বানাতে। যখন সে গল্প বানায়, কেউ যদি তখন তার হালটা দেখতো। সবগুলো নরম চুল একেবারে শক্ত খাড়া হয়ে যায়। তাকে দেখায় তখন ঝোড়ো কাকের মতো। তার দৃষ্টি চলে যায় অন্য কোনো জগতে। মর্ত্যের কোনো মানুষকে তখন সে চিনবে কিনা, বলা শক্ত। আর তার পা, তখন থাকে মেঝে থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে। সে আসলে তখন চলে যায় অন্য জগতে। গল্পের জগতে। অতীন্দ্রিয়তা ভর করে তার শরীরে। আর সমস্ত ঘরটা কমলা আলোয় ভরে যায়। গল্প বানানো শেষ হলে সেটা ঝোলার মধ্যে ঢোকানোর পর ধীরে ধীরে সে নেমে আসে মাটিতে। কমলা আলো নিভে আসে। সে নীরব পায়ে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের পাশে শুয়ে পড়ে। ছেলের মুতের কাঁথা পাল্টে দেয়।

কিন্তু তার ঘুম আসতে চায় না। গল্পটার উপাদানগুলো কেন সে আরেকটু রদবদল করলো না, এই বোধ তার ঘুমের ভেতর তাকে তাড়া করতে থাকে। ঘুমের মধ্যে, সে এ পাশ-ও পাশ করে।

৩

ডাব্লুর গল্পটা নিয়ে তাদের পাড়ায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। কারণ পাড়ার সব তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরী নিজ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে ডাব্লুর কান্ড। তারপর গল্পওয়ালা বিদায় নিলে, একজন দুজন করে ঘিরে ধরে ডাব্লুকে। তারা ডাব্লুকে বলে, জিনিসটা কী, দেখাও না ডাব্লু। ডাব্লু তাদের দেখায় না। বালক বালিকা সবাই খুব মন খারাপ করে। তারা বলে, নিশ্চয় পচা কোনো কিছু হবে তা না হলে কী এমন জিনিস যে দেখানো যাবে না।

ডাব্লু ভাবে, হুঁ, এইভাবে তো ভাবা যায়। জিনিসটা পচা। ডাব্লু ঠকেছে। তাই কাউকে সে দেখাচ্ছে না। দাঁড়া। সে তখন পাড়ার শাম্মীপুকে ডাক দেয়। শাম্মী আপু, চলো না আমাদের বাসায়। তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো।

শাম্মীর তখন পেট ফেটে যাচ্ছে কৌতূহলের চাপে। সে তাড়াতাড়ি যায় ডাব্লুদের বাসায়।

শাম্মী হলো মহল্লার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। কলেজে পড়ে। রোজ কলেজে থেকে ফেরার পর শাম্মী সের খানেক চিঠি বের করে তার ব্যাগ থেকে। যাওয়া আসার পথে পাড়ার যুব সমাজ এই চিঠিগুলো তাকে রোজ রোজ উপহার দেয়। শাম্মী সেই চিঠিগুলো জমিয়ে রাখে তাদের স্টোর রুমে। মোট পাঁচ বস্তা চিঠি এসেছে। আরো কিছু জমলে স্টোর রুমে আর একতিল জায়গা থাকবে না। তখন যে কী হবে!

ডাব্লু বলে, শাম্মীপু, তুমি আমার জন্যে কী এনেছো?

শাম্মী বলে, তোর জন্যে আবার কী আনবো রে ডাব্লু।

'এই ধরো একটা চুইংগামের প্যাকেট, কি একটা ভালো চকলেট।'

'যাহ্। একদম ভুল মেরে বসে আছি। আসলে ওই গল্পওয়ালা তোকে কী দিয়ে গেলো, সেটা জানার জন্যে আমার পেট ফেটে যাচ্ছে।'

'ভালো। জানার ইচ্ছা থাকা ভালো। এটাকে বলা হয় জিগীষা।'

'শোন্। আমার খুব অস্থির অস্থির লাগছে। পেট ফুলে গেছে কৌতূহলে! দ্যাখ। শাম্মী তার কামিজ তুলে পেট দেখায়।' কী সুন্দর পেট শাম্মীপুর। ডাব্লুর ভালোই লাগে দেখতে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে ডাব্লু ফিক করে হেসে ফেলে। শাম্মী আপুর পাজামার ওপরের দিকটা অন্য কাপড়ের তৈরি। মনে হয়, কাপড় কম পড়ে গিয়েছিল।

'হাসছিস কেন?'

'না। হাসছি না। তোমার পেট তো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এখন কী হবে।'

'উহ্। পাকামো করিস না তো ডাব্লু। জিনিসটা দেখা।'

'কিন্তু একটা চকলেট, নয়তো চুইংগাম।'

তখন ধাম করে ডাব্লুর গালে একটা চুমু দেয় শাম্মী, বলে, এই চুমুর দাম একলাখ টাকা। দেখা এখন পাকা ছেলে। জিনিসটা দেখা। জিনিস পছন্দ যদি হয়, তাহলে, তুই যখন বড়ো হবি, তোকে আমি বিয়েও করতে পারি।

'ধ্যত। বাজে বকোনা তো আপু।'

'কীরে পাকা ছেলে। তোর তো নাক ঘামছে। তোর বউকে তুই বুঝি খুব ভালোবাসবি।'

'যাও শাম্মীপু। তোমাকে গল্পটা শোনাবো না।' ডাব্লু গাল ফোলায়।

'ওরে বাবুর রাগ হয়েছে। শোনা বলছি। সত্যি চকলেট দেবো। প্রমিজ।'

'আচ্ছা। এই সুতাটা ধরে টান দাও। একটা ছোট্ট টান।'

শাম্মী টান দেয়। আর তখনই ঘটে সেই অলৌকিক ঘটনাটা। শুরু হয় মাখনরানীর গল্প। সে যে কী এক ঘোর লাগা অবস্থা, গল্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাম্মী বসে থাকে সম্মোহিতের মতো। গল্প শোনা শেষ হলেও সম্মোহন কাটতেই চায় না। শাম্মী বসে থাকে চুপচাপ। ডাব্লুও।

তারপর নীরবতা ভাঙে ডাব্লুই। 'কেমন লাগলো।'

শাম্মী কথা বলতে পারে না। মুগ্ধতা আর বিস্ময়ের ঘোর কি আর এতো সহজেই ভাঙে?

'শাম্মীপু, কাউকে বলো না। ব্যাপারটা কেবল তোমার আমার মধ্যেই

থাকুক। তাই না? জিনিসটা সস্তা বানানোর দরকার কী। তাই না।'

শাম্মী কাউকে ভেঙে বলে না ব্যাপারটা। যদিও নানা জনে নানাভাবে তার কাছে জানতে চায় গল্পওয়ালার গোপন রহস্য। তার পরের দিন সে থাকে তক্কে তক্কে। কখন আসবে গল্পের ফেরিওয়ালা। প্রথম দফাতেই ধরে ফেলতে হবে তাকে। পাড়ার উৎসাহী যুবকদেরও সে বলে রাখে, আপনাদের কেউ যদি গল্পওয়ালার দেখা পান, তাকে নিয়ে আসবেন তো আমার কাছে। তার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

পরদিন পাড়ায় যেই পা দিয়েছে গল্পওয়ালা, হাঁক দিয়েছে তার দুঃখী অন্তরস্পর্শী সুরে— গল্প নেবেন গল্প, অমনি পাড়ার তিনজন যুবক তাকে একসঙ্গে বগলদাবা করে ফেলে। আরে মিয়া চলো।

'কোথায়?' গল্পওয়ালা জিজ্ঞেস করে।

'এতো কথা কওনের কাম কী?' যুবকেরা উত্তর দেয়।

'আপনারা অমন করে কথা বলছেন কেন? ছাড়ুন। বলুন, কোথায় যেতে হবে। যাচ্ছি।'

'ধরতো রে ব্যাটারে।' তিনযুবক মাথায় তুলে ফেলে গল্পওয়ালাকে, এনে হাজির করে শাম্মীর বাসার গেটে।

শাম্মী তার দোতলা বাসার জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল গল্পওয়ালার জন্যেই। ব্যাপার দেখে সে দৌড়ে আসে। 'অ্যাই অ্যাই করো কী করো কী; উনি ব্যথা পাবেন তো।'

'আরে কও কী, মাথায় তুইলা আনার কথা, আনছি তো। শাহেনশাহর আদব দিছি না। লও'— যুবকেরা গল্পওয়ালাকে নামিয়ে দেয় মাথার ওপর থেকে।

গল্পওয়ালা ব্যাপারটার আগামাথা কিছুতেই বুঝতে পারে না। ঘটনার আকস্মিকতার ঘূর্ণিটা কেটে গেলে সামনের দিকে তাকায়। তার সামনে একটা তরুণী। তারুণ্যে আর সপ্রাণতায় যে ঝকঝক করছে। সে বলে, ভাইয়া আপনার কোনো কষ্ট হয়নি তো। আই এম রিয়েলি স্যরি। আসলে আমারই ভুল। আপনাকে যেন ফার্স্ট চান্সেই আমি ধরে ফেলতে পারি, সেজন্যে ওদের বলে রেখেছিলাম। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

শাম্মীর পেছনে পেছনে গল্পওয়ালা হাঁটে। তার পায়ের শব্দ এমন, মনে হয়, দুঃখ আর ক্লান্তি উৎপাদিত হচ্ছে। শাম্মীদের বাসা এই ফ্লাটের দোতলায়। তারা সিঁড়ি ভাঙে। 'বসার ঘরে নয়, চলুন আমরা বরং ওই বারান্দাটায় গিয়ে বসি। ওদিকটায় কয়েকটা গাছ আছে। বারান্দার গ্রিলে এসে মাথা ঝাকাচ্ছে একটা দেবদারু। চলুন।'

বারান্দাটা খুব বেশি বড়ো নয়। তবে টবে বড়ো বড়ো পাতার কী একটা

গাছ আছে। সত্যি, গ্রিলের ফাঁক ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে কতোগুলো দেবদারুর পাতা। পাতাগুলোর গা এমন করে ছেড়ে দেওয়া, অথচ এমন ঝকঝকে যে, মনে হয়, আহ্লাদী পাতাগুলো অভিমান করে আছে। যেন মাথানিচু করে কোনো বালিকা পায়ের নখে মাটি খুঁটছে। তিনটা মোড়া পাতা আছে ওখানে। বেশ ঘরোয়া ভঙ্গিতে বসতে হয় গল্পওয়ালাকে। গল্পওয়ালার অস্বস্তি লাগে। অন্যের ঘরদোর মাড়িয়ে আসতে হয়েছে তাকে। বৈঠকখানায় কার্পেট পাতা ছিল। সে জুতা খুলবে কি খুলবে না— এই দ্বিধায় ছিল। তবে শেষতক খোলেনি। তার মনে হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবনের কার্পেটও খুব দামি। তাই বলে বিদেশী রাষ্ট্রদূত তো সেখানে জুতা খুলে ঢোকে না। এখন তার হাঁটুর কাছে বসে আছে একটা প্রায় চোখ ধাঁধানো রূপসী মেয়ে। সে কথায় কথায় হাসছে, আর চুল ঝাঁকাচ্ছে। এক গোছা এলায়িত চুল এসে পড়ছে কপালে, চোখে। বার বার সে হাত নেড়ে সেই চুল সরাচ্ছে।

'আপনার গল্পটা আমি শুনেছি'— শাম্মী বলে।

ধুক করে কেঁপে ওঠে গল্পওয়ালার বুক। 'কোন গল্পটা?'

'ওই যে ডাব্লু যেটা কিনেছে। মাখনরানীর গল্প। হি হি হি।'

মেয়েটা হাসছে, যেন, পুরো বারান্দা উঠছে ঝকমকিয়ে, আর দেখো, মেয়েটার উপরের পাটির বাঁ দিকে একটা দাঁত নেই। তাতেই যেন মেয়েটা আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

'কেমন লেগেছে গল্পটা'— খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে গল্পওয়ালা। তার গল্প, তার নিজের বানানো একটা গল্প, অন্য আরেকজন তা চেখে দেখেছে, কেমন লেগেছে তার। সনাতন গৃহিনী যেমন ব্যঞ্জন রেঁধে পরিবেশন করার পর স্বামীসন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনি এক কাতর অবস্থা গল্পওয়ালার।

শাম্মী তার মুখের ওপরে চলে আসা কুন্তলগুচ্ছ ডান হাতে সরায়, তারপর করুণ করে হাসে, একবার চোখের পাপড়ি বন্ধ করে, ঠোঁট গোল করে— শব্দটা বেরুতে খানিক সময় নেয়, গল্পওয়ালার কল্জে শুকিয়ে কাঠ— সুন্দর, খুব সুন্দর। গল্পওয়ালার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

'আজ আপনি আমাকে একটা গল্প দিন। কী গল্প দেবেন?'

'নানান গল্প আছে আমার ঝোলায়। আপনিই বলুন, কী ধরনের গল্প আপনার পছন্দ।'

'না শুনলে কেমন করে বুঝবো কোন গল্পটা ভালো। আপনি এক কাজ করুন। সবগুলো গল্পই আমাকে দিয়ে দিন। ঝোলা খালি করে ফেলুন। কতো দাম হবে— আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি।'

'না। তা হবে না'— গল্পওয়ালা মাথা ঝাঁকায়। সবগুলো গল্প আমি একজনের কাছে দেবো না। একজন একদিনে পেতে পারে শুধু একটা গল্প। সব গল্প একজনকে দিলে গল্পের মর্যাদা থাকবে না। হয়তো শোনারই সময় হবে না তার। বাক্সের মধ্যে ফেলে টেলে রাখবে।'

'ও বাব্বা। আপনার তো ডাঁটও আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার মনের মতো একটা গল্প আপনি আপনাকে দিন।'

'মনের মতো গল্প। একটা গল্প আপনাকে দেওয়া যায়। কিন্তু দাম বেশি পড়বে।'

'বেশি। কতো?'

'এই একশ টাকা'— সংকোচের সঙ্গে বলে গল্পওয়ালা।

'একশ টাকা! এ আর এমন কী! এই নিন'— বলে শাম্মী তার ব্যাগ খুলে একটা কড়কড়ে একশ টাকার নোট বের করে দেয় গল্পওয়ালার হাতে। গল্পওয়ালা টাকাটা হাতে নিতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে ছুঁয়ে ফেলে শাম্মীর আঙুল, তার হাতে যেন গোলাপের কলির স্পর্শ লাগে। তার মনে হয়, এই টাকা সে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু সে দেয় না, দেওয়া হয় না। খুব নিস্পৃহ একটা ভঙ্গি চোখে মুখে ফুটিয়ে সে একটা গল্প বের করে ঝোলা থেকে। তুলে দেয় শাম্মীর করকমলে। শাম্মীকে বলে, সুতোটায় একটা টান দিন।

শাম্মী আহ্লাদী গলায় বলে, আপনি দিন। আপনি তো গল্পের কারিগর। আপনি সুতোটায় টান দিলে বেশ উদ্বোধন উদ্বোধন দেখাবে। আহা, গল্পটার গায়ে যদি শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা যেতো, এই গল্পের উদ্বোধন করেন এর কারিগর...।

'না না। সে খুব বিশ্রি ব্যাপার হবে। উদ্বোধন করা খুব মহৎ ব্যাপার নয়। আমাদের সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই একটা করে মার্বেল পাথর আছে। তাতে একজন করে মহাজনের নামও খোদাই করা। কিন্তু ওই মহাজনেরা এখন পরিগণিত হচ্ছেন দুর্জন হিসেবে। আর প্রতিষ্ঠানের গায়ে তার নামটা সাক্ষ্য দিচ্ছে— এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তার পথচলার শুরুতে অত্যন্ত বাজে লোকদের কাছে মাথা নত করে রাখতে বাধ্য হয়েছিল।'

'বাদ দিন। বাদ দিন। আপনি লেকচার দিচ্ছেন। লেকচার দেওয়া আমি একদম পছন্দ করি না। আসুন। আমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে গল্পটা শুরু করি।' শাম্মী ফট করে গল্পওয়ালার হাত ধরে, তারপর দুজনে মিলে টান দেয় গল্পটার সুতোয়।

ব্যাস গল্প শুরু হয়ে যায়।

এক ছিল পরমাসুন্দরী কন্যা
সে থাকতো জলে।

এতো রূপসী কন্যা যে, সে যেদিক দিয়ে যেতো, সেদিকটাই আলোকিত হয়ে থাকতো। আর বহুক্ষণ ধরে সেখানে বিরাজ করতো গা ঝমঝম করা কস্তুরি সৌরভ।

তার ছিল খুব মায়াবী হৃদয়। অন্যের সামান্য বেদনায় সে কাঁদতো, অন্যের খুশির খবরে সে ঝলমলিয়ে উঠতো খুশিতে। তার খুশির হাসি রিনরিন করে ছড়িয়ে পড়তো এদিকে সেদিকে। চৌদিকে। মেয়েটার বয়স বাড়ে। তার মনে হয়, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।

একদিন সমুদ্রে উঠলো খুব উথাল পাথাল ঝড়। এক সওদাগর-নৌকা তখন, দুর্ভাগ্যক্রমে, ছিল মাঝদরিয়ায়। নৌকা গেলো উল্টে। মাঝি-মাল্লারা ছিটকে পড়লো কে কোথায়। নৌকায় ছিল এক সওদাগর, নাম তার চাঁদ।

ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে সে ভাসতে চাইলো, দু'বাহুতে সমস্ত শক্তি এনে চাইলো ঝড়ের ঝুটি ধরে ভাসতে, কিন্তু পারলো না, গেলো তলিয়ে।

তখন এগিয়ে এলো মৎস্যকন্যা। ছুটে গেলো চাঁদের কাছে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তাকে নিয়ে উঠলো সমুদ্রজলের উপর তলে। আহা বেচারা। এই বুঝি মরে শ্বাসবন্ধ হয়ে। ঝড়ের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে মৎস্যকন্যাকেও। সে জলেরই মেয়ে, জলের নিচে যেখানে ঝড় নেই, সেখানে টুপ করে নেমে গিয়ে আত্মরক্ষা করা তার জন্যে কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু পানির ভেতরে এই সওদাগর বাঁচবে কী করে। হাতির সমান উচ্চতার একেকটা ঢেউ, তাদের সিংহের মতো গর্জন। ঢেউয়ের মাথায় উঠে গেলো মৎস্যকন্যা— তার এক হাতে সে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে সওদাগরকে। যুবকটি তখন সম্পূর্ণ অচেতন। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ তাদের তুলছে এই আকাশে, আবার সজোরে ফেলে দিচ্ছে নিচে। নিজের জীবন যদি যায়ও যাক, তবুও সে মরতে দেবেনা এই যুবককে।

তারপর একসময় সেও হারিয়ে ফেললো সংজ্ঞা। জ্ঞান যখন ফিরলো, তখন সে দেখতে পেলো, সে শুয়ে আছে এক শান্ত সৈকতে, জল এসে ধুয়ে দিচ্ছে তার শরীর, আর তার বাহুতে শুয়ে এক যুবাপুরুষ। সে যুবকের বুকের কাছে কান রাখলো। বেঁচে আছে।

কী করে বাঁচানো যায় এই যুবককে। মৎস্যকন্যার মাথায় ক্রিয়া করে উঠলো কী এক অলৌকিক প্রত্যাদেশ। সে যুবকের পেটে চাপ দিলো, পিঠে চাপ দিলো, বের করলো খানিক পানি। তারপর তার মুখে মুখ রেখে চালু করতে চেষ্টা করলো

শ্বাসপ্রশ্বাস।

যুবক ফিরে পেলো তার চেতনা। আর তার অধর ওষ্ঠের সঙ্গে আবিষ্কার করলো অন্য এক জোড়া ঠোঁট। অপূর্ব সেই স্বাদ, যেন অমৃত, আর অমৃত বলেই মৃত্যুর কোল থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে যুবক।

যুবকের শরীরে প্রাণের স্পন্দন ও উত্তাপ ফিরে আসছে, আর তখন শুশ্রূষাময়ীর হৃদয়েও সঞ্চারিত হতে থাকে উত্তাপ, সে লজ্জা পায়। আর দূরে সরে যায়।

যুবক ধাতস্থ হয়, উঠে বসে, চোখ মেলে তাকায়। কে ও! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য কে একটি মাত্র মুখে বেঁধে রেখেছে ওভাবে!

মেয়েটি জলের আড়ালে তার নগ্নতা লুকায়। তারপর মেয়েটি চেয়ে থাকে ছেলেটির দিকে, ছেলেটি চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। তারা চোখ সরাতে পারেনা।

একসময় মেয়েটির কী মনে হয়, সে চলে যায় জলের গভীরে তার আপন পুরীতে।

ছেলেটি তারপর থেকে পাগলপ্রায়। সে বসে থাকে সেই সমুদ্রতটেই। নড়ে না চড়ে না।

আর মেয়েটি! জলের গভীরে তার ঘুম আসে না। তার মনের ভেতরে এক দুর্নিবার টান। কোত্থেকে আসে এই টান!

এই সমুদ্রগর্ভের কতো কতো পুরুষ মাছের সঙ্গেই তো তার দেখা হয়েছে, কই কারো জন্যে তো সে বোধ করেনি এমন আকর্ষণ। আজ কী হলো তার! কী হয়েছে তার! হা বিধাতা, তুমি আমার হৃদয়ে সর্বনাশের এ কী বীজাণু ঢুকিয়ে দিলে। আমার এমন বোধ হচ্ছে কেন?

আর সওদাগর যুবক তার হাতে তুলে নেয় একটা শঙ্খ। ওই নির্জন সমুদ্র তীরে সেই শঙ্খে মুখ লাগিয়ে সে শব্দ তোলে। সেই শব্দতরঙ্গ জলতরঙ্গ বেয়ে বেয়ে ঠিকই গিয়ে প্রবেশ করে মৎস্যকন্যার কর্ণকুহরে। কী যে ইন্দ্রজাল ছিল সেই শঙ্খধ্বনিতে, কন্যা আর স্থির থাকতে পারে না।

সে ভেসে ভেসে চলে আসে সৈকতের খুব কাছে। মাথা তোলে। তাকে দেখে যুবক বুঝতে পারেনা— সে কী করবে। সে ছুটে চলে আসে কোমরজলে। তারপর থামে। তারপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।

তখন সূর্য ডুবে যায়। কোমরজলে দাঁড়ানো যুবকটিকে মনে হয় পিতল দিয়ে বানানো এক অপূর্ব ভাস্কর্য।

আর আকাশে তখন কনে-দেখা আলো। নারীমূর্তিটিকে স্বর্গের এক

দিব্যপ্রতিমা ছাড়া কেই বা কী ভাবতে পারে।

অনেকক্ষণ কেটে যায় এমনি করে। চোখের মধ্যে চোখ রেখে। চাঁদ ওঠে। জলের মধ্যে দেখা যায় চাঁদের টান। জ্যোৎস্নায় জ্বলে ওঠে সমুদ্রের ফসফরাস। বালুকাবেলায় চাঁদের আলো, মনে হয়, শুয়ে আছে এক শঙ্খচিল। তার বিশাল শাদা পাখা মেলে।

মেয়েটি আর থাকতে পারে না। তার ঠোঁটে লেগে আছে যুবকের ঠোঁটের রক্তে মাতন তোলা স্বাদ।

ছেলেটি আর থাকতে পারে না। তারা পরস্পরের দিকে এগোয়। অর্ধেক জলে আর অর্ধেক ডাঙ্গাতে— দুটো মুক মুখ পরস্পরের কাছে ভিড়তে থাকে, তারপর তাদের মধ্যে আর কোনো দূরত্ব থাকেনা। চারটা ঠোঁট এক হয়। ওষ্ঠ আর অধর, তার মধ্যে ওষ্ঠ আর অধর। তারা পরস্পরের মুখসুধা পান করে। ছেলেটি মেয়েটির চুলে বিলি কেটে দেয়। আর মেয়েটি এক হাতে নেড়ে দেয় ছেলেটির ঘাড়ে পড়া চুলগুলো।

মেয়েটি কোমর জলে দাঁড়ায়। চাঁদের আলো লজ্জা পায় তার উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গের সৌন্দর্যের বিভায়। ছেলেটি পাগল হয়ে যায়। সে তার বুকের মধ্যে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

ভোর হওয়ার আগেই মেয়েটি ফিরে যায় তার পাতালপুরীতে।

এমনিভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন।

ছেলেটি একদিন বলে মেয়েটিকে, চলো, ওই নগরে। মেয়েটি দেখে, দূরে নগরের গৃহে গৃহে জ্বলছে প্রদীপ। মেয়েটির মন যেতে চায় ওই দিকে।

সমুদ্রে কখন ভাটা এসে গেছে মেয়েটি খেয়াল করেনি। বেশ খানিকক্ষণ পরে তার হুঁশ হয়। সে দেখতে পায়, সে পড়ে আছে বালিতে তার নিম্নাঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে আছে। যুবক দেখে, তার কাঙ্ক্ষিতা অর্ধেক মানবী, অর্ধেক মৎস্য।

এই নারীকে নিয়ে সে কী করবে।

তবু সে এই কন্যাকে ছাড়তে পারে না। তার উর্ধ্বাঙ্গের কণায় কণায় সে আদর বুনতে থাকে।

কিন্তু ডাঙ্গায় মেয়েটার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তার যে ফুসফুস নেই, আছে ফুলকো। তাকে আবার নেমে পড়তে হয় জলে।

যুবক ধীরে ধীরে চলে যায় নগরের দিকে। পুরুষের চরিত্র বোঝা ভারি দুষ্কর। নগরের প্রমোদালয়গুলোয় তখন জ্বলে উঠেছে ঘিয়ের প্রদীপ। আগুনে ঝলসানো হচ্ছে মাংস। নগর-নর্তকীরা নুপুর নিক্কনে মাতিয়ে তুলেছে জলসাঘর।

মদে আর মাৎসর্যে যুবক ভুলতে চেষ্টা করে তার অর্ন্তজ্বালা। কিন্তু পারে না।

আবার ছুটে ছুটে আসে সমুদ্রে সৈকতে।

মেয়েটিও আসে।

এক রাতে আকাশে কোনো চাঁদ ছিল না, ছিল নক্ষত্রের উৎসব, সমুদ্রজল জ্বলছিল ফেনায় ফেনায়, ঝাউগাছগুলো দুলছিল থিরিথিরি বাতাসে; আর ছেলেটি এসেছিল আকণ্ঠ মদ্যপানে করে। মেয়েটি এসেছিল ছেলেটির জন্যে সমুদ্রের সবচেয়ে দামি রত্নটি নিয়ে।

মেয়েটিকে আধো অন্ধকারে আধো ছায়ায় দেখে, পিছলানো দেহের স্পর্শ পেয়ে, তার দেওয়া রত্নটি মুঠোয় ধারণ করে মাতাল যুবর্ক হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রিরংসায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। শরীরের সন্ত্রাস তাকে অন্ধ হতচ্ছাড়া করে ফেলে। কিন্তু নিয়তি এই যে, ব্যর্থকাম হতে সে বাধ্য। পাগলপ্রায় যুবক মেয়েটিকে হঠাৎই ফেলে রেখে চলে যায়। তার মাথায় তখন একশ একটা অগ্নিগিরির লাভা।

মেয়েটি খুবই দুঃখ পায়। সে হলো পৃথিবীর শুদ্ধতম শিল্পশরীর, কেননা তার আছে অপার সৌন্দর্যভার কিন্তু নেই জৈবতাড়না। সে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফেরে।

উন্মত্ত যুবক নগরের দ্বারে এসে ওষ্ঠে পোরে অঙ্গুরীয়ের বিষ। তার জীবনাবসন ঘটে।

আর মৎস্যকন্যা রোজ রোজ এসে চোখ পেতে রাখে সমুদ্রসৈকতে। ওই দূরে দেখা যায় নগরের আলো। কিন্তু তার প্রিয়তম মানুষটি আর আসে না।

মেয়েটি কাঁদে। তার চোখের নোনা জল মিশে যায় সমুদ্রের জলে। কেউ জানে না, কিন্তু ঘটনা এই যে, ওই মেয়েটির চোখের নোনা জল মিশে মিশে সমুদ্রের জল এতো লবণাক্ত।

গল্প শেষ হয়। শাম্মী তার গল্পের সুতোয় দু'বার টানতে যায় ভুলে। এতোই গভীর মন দিয়ে সে শুনছিল এই গল্প, গল্পের রেশ যেন কাটতেই চায় না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চোখ তুলে তাকায় গল্পওয়ালার দিকে।

কিন্তু একী। গল্পওয়ালা তো তার সামনে নেই। কখন উঠে নীরব পায়ে সে বিদায় নিয়েছে সেই জানে।

লোকটা চলে গেলো কেন? এভাবে, অলক্ষিতে। বোধ করি, এই গল্পটা সে তার সামনে পরিবেশিত হতে দেখতে চায়নি। হয়তো এই গল্প একজন তরুণীকে এভাবে সামনাসামনি বলাও যায় না। কিংবা সে ভয় পেয়ে গেছে, গল্পটা পুরোটা শুনবার পর শাম্মীর প্রতিক্রিয়া কী হবে তাই ভেবে।

শাম্মীর কিন্তু গল্পটা বেশ ভালো লেগেছে। গল্পওয়ালাকে এই কথাটা জানানো দরকার। এছাড়াও তাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করার দরকার। গল্পওয়ালা

এমন একটা গল্প বানালো কেন? এই গল্পের উদ্দেশ্য কী? এই গল্প থেকে শ্রোতা কী বার্তা পাচ্ছে?

বার্তাটা যে আসলেই কী, শাম্মী বুঝতে পারে না। কেবল এক অনির্বচনীয় দুঃখের অনুভূতিতে শাম্মীর সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বারান্দাটা ছেড়ে তার উঠতেও ইচ্ছা করে না। গ্রিলে মাথা রেখে শাম্মী চুপচাপ বসে থাকে। উদ্দেশ্যবিহীন।

৪

গল্পওয়ালা রাতারাতি নাম কামিয়ে ফেলে। শাম্মী, মহল্লার কেন্দ্রীয় আলোচিত চরিত্র, মৎস্যকন্যার গল্পটা শোনে বার বার। সুতোয় একবার টান দিলে গল্প বেজে ওঠে, দুবার টান দিলে থামে। একই গল্প, সে বার বার শোনে। গল্পটা তাকে কেন টানে, সে বুঝে উঠতে পারে না। এরই মধ্যে সে উৎসাহী যুবকদের বলে রেখেছে, গল্পওয়ালার দেখা পাওয়া মাত্র যেন তাকে সসম্মানে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। সে অপেক্ষায় থাকে, প্রতীক্ষায় থাকে, কিন্তু গল্পওয়ালা আর এ পাড়ার দিকে পা বাড়ায় না। সম্ভবত একজন রূপবতী তরুণীর সামনে সে ওই গল্পটার পর হাজির হতে চায় না।

কিন্তু অন্য পাড়ায়ও তার গল্পগুলো বিক্রি হতে থাকে। ডাব্লু তার গল্পটার কথা ছড়িয়ে দিয়েছে পুরো স্কুলে, আর স্কুলের ছাত্রদের এ কান থেকে ও কান হয়ে এখন এই গল্পের ফেরিওয়ালা হয়ে ওঠে শহরে প্রধান আলোচ্য। গল্পপ্রিয় ছেলেমেয়েরা হাতে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়, দরজায়, বারান্দায়, পথের মোড়ে।

গল্প দারুণ বিক্রি হচ্ছে। টাকাও আসছে দেদার। গল্পওয়ালাকে আর বাকেরের দোকানে বাকি খেতে হয় না। বরং বকেয়া দেনা সবই গল্পওয়ালা শোধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

দিন যায়। এর মধ্যে ঘটে একটা অন্যরকম ঘটনা।

বাকের দোকানদার তার বউয়ের জন্যে চিঠি লেখাতে আসে গল্পওয়ালার কাছে। কিন্তু গল্পওয়ালার দেখা সে পায় না। পাবেই বা কোত্থেকে। শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা গল্পের ঝোলা নিয়ে গল্পওয়ালা ছুটছে, তার যাচ্ছে ব্যস্ত দিন। এখন আর বসে গল্প শোনানোর সময় নেই তার। গল্পখন্ডটা খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে টাকা হাতে নিয়ে সে ছুটে যায় অন্য খদ্দেরের কাছে।

দিনের বেলা গল্পওয়ালাকে না পেয়ে বাকের দোকানদার হানা দেয় রাত্রিবেলায়, গল্পওয়ালার বাড়িতে। গল্পওয়ালা তখন ঘরে বসে গল্প বানাতে ব্যস্ত।

তার পা দুনিয়ার মাটির খানিকটা ওপরে। ঘরে কমলা আলো।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। গল্পওয়ালা ভাই আছেন নাকি! দোকানি গলা বাড়িয়ে বলে।

ধপ্ করে মেঝেতে পড়ে যায় গল্পওয়ালা। কী ব্যাপার, কী ঘটলো? তখন দরজায় আওয়াজ হয় ঠক্ ঠক্। 'ও গল্পওয়ালা ভাই, আমার ফেমিলির এবারের চিঠিখানা লেইখা দিবেন না।'

গল্প বানানোর খেই হারিয়ে ফেলে গল্পওয়ালার মেজাজ তখন সত্যি খাট্টা হয়ে আছে। সে জবাব দেয়, 'না। দেবো না।'

'ও। এখন টাকা পয়সা হইছে বইলা আমাগোরে ভুইলা গেলেন। ভাইজান দ্যাহেন। আপনার ভাবি কিন্তু চিঠির লাইগা বইয়া রইবো। তারে দাগা দেবেন।'

'তা কেন? আপনি অন্য কাউকে দিয়ে লেখান।'

রাগে গজর গজর করতে করতে দোকানি চলে যায়। কিন্তু চিঠি লেখা তারও অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। সেই বা নিজেকে নিবৃত্ত করবে কী করে। সে যায় অন্য এক ভদ্রলোকের কাছে। বাকিতে জিনিসপাতি খরিদ করার মতো ভদ্রলোকের অভাব দোকানির হয় না। তাকে সে বুঝিয়ে বলে তার সমস্যাটা। ভদ্রলোক তাকে চিঠি লিখে দিতে রাজি হন। বাকের দোকানি বলে, ভদ্রলোক লেখেন। পাকজনাবেষু স্ত্রী, সালাম নিবা।

এই চিঠি যখন পৌঁছায় তার স্ত্রী কুসুমের হাতে (কুসুম পড়তে জানে), সে বিস্মিত হয়। এ চিঠি তো তার স্বামীর চিঠি হতে পারে না। তার স্বামী বাকের দোকানি কতো ভালো লেখে। এসব কী কথা, পাকজনাবেষু। আগে সে কতো সুন্দর করে লিখতো, প্রিয় কুসুম, কেমন আছো।

ব্যাপার কী? তার স্বামীর বদলে কি অন্য কেউ তাকে চিঠি লিখেছে? কুসুম শহরে চলে আসে। মহিলা নিঃসন্তান, ফলে নির্ঝঞ্ঝাট, আর শরীরের বাঁধনও মাশাল্লা ভালো। তার স্বামী বাকের দোকানদার থাকে দোকানেই, আর দোকানের পেছনে একটা ঘুপচিতে হয় তার রান্নাবান্না।

কুসুম আসে দুপুরবেলা, তাকে দেখে বাকের দোকানি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত ও চিন্তিত।

'কী ব্যাপার তুমি?'

কুসুম বলে, আমি আসলাম, আমারে বসতে দ্যাও। কুশল জিগাও। তারপর কী ব্যাপার, কী ব্যাপার, এই সব কও।

'বসতে দিমু কই! তোমারে বসতে দিলে তো আমার দোকানের ঝাঁপ ফেলতে হয়।'

'তাই ফেলো।'

'ঘটনা কী? আগে বিত্তান্ত কও।'

'তোমার নাম দিয়া কে জানি আমারে চিঠি দিছে।'

'কও কী।'

'হ। এই যে চিঠি। দ্যাখো।'

'ও। এই চিঠি। পড়ো তো দেখি।'

কুসুম পড়ে। বাকের দোকানি বলে, ও। এইটা আমিই লেখছি।

'না। কী কও। আগে কী সুন্দর লিখতা। কী সুন্দর একেকটা চিঠি। কী তার কথা। কী তার হাতের লেখা।'

'আর কইও না। আগে এক ব্যাটা লেইখা দিতো। সে অহন গল্পওয়ালা সাজছে। গল্প বানাইয়া বিক্রি করে।'

'ও আচ্ছা।' কুসুম গম্ভীর হয়ে যায়। তার চোখ-মুখ লাল। তার কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। তার মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাহলে তার স্বামী কে? গত তিন তিনটা বছর ধরে এই চিঠিগুলোকেই সে স্বামী বলে ভেবে এসেছে। সবগুলো চিঠি তার তোষকের নিচে রাখা। সে এই চিঠিগুলোর সঙ্গেই রাত্রিযাপন করেছে। চিঠি আর স্বামী তার কাছে সমার্থক। চিঠিগুলো লিখেছে যে গল্পওয়ালা, তাকেই কি তাহলে সে এতোদিন ধ্যানজ্ঞান করেনি? তার হাতের লেখা, তার কথাবলার ধরন-ধারণ— প্রিয় কুসুম, আকাশে অনেক তারা, মেঘ নেই, নেই চাঁদও, তারার মেলায় মনে হয় কাজলবিলে থরে থরে ফুটে আছে শাপলা শালুক, বকুল ফুলের একটা মালা তুমি দিয়েছিলে, আমি রেখে দিয়েছি, সেই শুকনো মালা থেকে আজ আসছে টাটকা সুঘ্রাণ— সেই বকুলমালা বুকে জড়িয়ে আমি কেবল তোমার কথা ভাবছি কুসুম— এইসব বর্ণনা তো তার স্বামীর নয়। কার তবে? কে সেই গল্পওয়ালা?

কুসুমের কোনো দোষ নেই। স্বামীর চিঠিগুলো পড়ে পড়ে তার স্বামী শহরে কোথায় থাকে, কেমন থাকে— এসব নিয়ে তার একটা নিজস্ব কল্পনার জগত গড়ে উঠেছে। আর এখন এই শহরে এসে স্বামীর দোকান আর সংলগ্ন ঘুপচিটার সঙ্গে সে চিঠির বকুলফুল সুরভিত বর্ণনার কোনো মিল পায় না। বাইরের কলতলায় যুদ্ধ করে প্রকাশ্যে গোসল সেরে যখন সে ফিরছিল, তখন মহল্লার বখাটেরা তার জল ভেজা কোমরের প্রশংসা করে। তারপর দোকানের পেছনের ঘুপচিটায়, দুটো চাউলের বস্তার পাশে সামান্য পরিসরে কুসুম শুয়ে পড়লে তার তন্দ্রামতো আসে। আজ তাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে অতি ভোরে। তারওপর যুক্ত হয়েছে ভ্রমণক্লান্তি। সব মিলিয়ে দোকানের পেছনে সে যখন একটা সংক্ষিপ্ত ঘুমের ভেতরে আশ্রিত, তখন

হঠাৎই তার মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে নারীকণ্ঠের লাস্যময় সংলাপ। ঘুম ভেঙে গেলে সে প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না— সে কোথায়। চোখ রগড়ে সে ধীরে ধীরে উঠে বসে, তারপর দোকানের পেছনের পর্দার আড়াল থেকে ভেতরে দৃষ্টি ফেলে।

দেখতে পায় দোকানে ভিড় নেই, একটা ছেমড়ি হি হি করে হাসছে, তার স্বামী সেই মেয়ের দিকে যাচ্ছে হাতের তালুতে কী একটা তরল নিয়ে। কুসুমের মাথা কাজ করতে শুরু করলে সে বুঝতে পারে বাকেরের হাতে নারকেল তেল, আর সে নিজ হাতে সেই তেল জনৈক ছিনালের মাথায় মাখিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি গলা বাড়িয়ে আদুরে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, আর বাকের দোকানের পাটাতনের আরো সামনের দিকে অবস্থান নিয়ে মেয়েটির শরীরে হাত বুলোতে চায়। মেয়েটি বলে, তেল মাখা হাত লাগায়েন না। সেদিন জামার মইধ্যে নারিকেল ত্যাল লাগায়া দিছলেন। শরমের ব্যাপার না।

বাকের বলে, আস্তে কথা কও। বাম হাতে ত্যাল লইছি। এইটা ডাইন হাত। তার ডান হাত সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গলকম্বল বুলিয়ে দিলে গরু যেমন গলা বাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েটির ভঙ্গি ঠিক তেমনি।

কুসুম কী করবে বুঝতে পারে না। কিন্তু তার মনে হয়, যে স্বামীর ধ্যানজ্ঞান সে তিনবছর ধরে করে আসছে, এ ব্যক্তি সে নয়।

কুসুম ঝুপড়ি থেকে পেছন দিক দিয়েই বের হয়, তারপর হন হন করে হাঁটতে থাকে রাগের মাথায়, যে দিকে দুচোখ যায়; কিছুক্ষণ হাঁটার পর তার হুঁশ হয়। বাইরে চোতমাসের পড়ন্ত দুপুর। মাথায় গনগন করছে সূর্য, গা চিটমিট করছে ঘামে— কিন্তু সেসব দিকে তার খেয়াল নেই, এখন সে কী করবে কোথায় যাবে— এই চিন্তা তার মাথায় উঁকি দেয়।

তখন তার মনে পড়ে সেই বকুল-সুরভিত চিঠিগুলোর কথা, এই প্রসঙ্গ তার শরীরে সৃষ্টি করে ঝিমঝিম অনুভূতি, সে কর্তব্য স্থির করে ফেলে— যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে গল্পওয়ালাকে।

কাজটা কঠিন হয় না। কারণ গল্পওয়ালা এখন এই পাড়ায় একজন মোটামুটি বিখ্যাত ব্যক্তি। রাস্তার লোকজন তাকে দেখিয়ে দেয় গল্পওয়ালার বাড়ি।

সেই বিকেলে সে হাজির হয় গল্পওয়ালার বাড়িতে। গল্পওয়ালার বাড়ি আগেরটাই রয়ে গেছে, কিন্তু তাতে লাগতে শুরু করেছে স্বচ্ছলতার স্পর্শ। তাদের ঘরের বাইরের দিকে একটা চালা তারা নিজেরাই লাগিয়ে নিয়েছে, আর সেখানে

বসার জন্য দুটো বেতের চেয়ারও এখন পাতা।

গল্পওয়ালা বাসায় ছিল না। কুসুম গিয়ে দরজায় আঘাত করলে দরজা খুলে দেয় রেবা।

'কাকে চান?'

'এইটা কি গল্পওয়ালা সাহেবের বাড়ি?'

'জি।'

'আমি একটু ওনার সাথে দেখা করতে চাই।'

'উনি তো বাসায় নাই।'

'কখন আসবে?'

'সন্ধ্যার আগে তো আসতে পারেনা। সন্ধ্যার পর পরই আসবে আর কী।'

'ও।' কুসুমের চোখেমুখে হতাশা।

'তার কাছে আপনার কী দরকার।'

'আছে একটা দরকার।'

'আমাকে বলা যাবে না?'

'না। আমি ওনাকেই বলতে চাই।'

'তাইলে সন্ধ্যার পর আসেন।'

কুসুম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। রেবাও দাঁড়িয়ে থাকে দরজার চৌকাঠ ধরে। মহিলা চলে যাবে, এই তার ধারণা। কিন্তু মহিলা নড়ে না।

'আপনি কি বসতে চান? তাহলে বসেন।'

'না ঠিক আছে। আমি বসবো না'— কুসুম বলে। তারপর চলে যাওয়ার ভঙ্গি করে। রেবা কবাট লাগিয়ে দেয়। তাদের বাসার সামনে কুসুম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যার পর গল্পওয়ালা আসে। তার কাঁধে ঝোলা। তার লম্বাটে চুলে কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব। বাড়ির বারান্দার বাতির আলোয় গল্পওয়ালাকে দেখে কুসুম ঠিকই চিনতে পারে।

গল্পওয়ালা অবশ্য কুসুমকে প্রথমে খেয়াল করেনি। কুসুমই এগিয়ে আসে, আর বলে, 'শোনেন। আমার নাম কুসুম। নারায়ণপুরের কুসুম। আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'জি। নারায়ণপুরের কুসুম'— গল্পওয়ালা মনে করার চেষ্টা করে। আসলে এতো শুধু তার ভনিতা, সে কুসুম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছে।

'চিনতে পারেন নাই? এই যে প্রতিমাসে একটা করে চিঠি লিখেছেন সেই

কুসুম।'

'ও। বাকের সাহেবের স্ত্রী। স্লামালাইকুম ভাবি। আসেন'— গল্পওয়ালা বিব্রত হয়। এখন এই মহিলাকে নিয়ে সে যাবে কোথায়?

'আপনার সাথে আমার কথা আছে'— কুসুম বলে।

'আচ্ছা যাবো একবার বাকের সাহেবের দোকানে। আপনার সঙ্গে গল্পগুজব করে আসবো।'

'বাকের সাহেবের কাছ থেকে আমি চলে আসছি। ওখানে আর যাবো না।'

'বলেন কী! কেন?'

'কারণ আছে। আপনাকে বলা যাবে না।'

'ঠিক আছে। না বললেন।'

'কিন্তু আপনার কাছে আমি আসছি অন্য কারণে।'

'কী কারণ বলেন।'

কুসুম কেঁদে ফেলে। 'আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আপনার পায়ের কাছে একটু খানিক জায়গা চাই।'

তারা কথা বলছিল বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে। রেবা, স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য আর বিলম্বে উদ্বিগ্ন, এই সময় দরজা খুলে বাইরে আসে। গল্পওয়ালা খুবই বিব্রত অবস্থায় পড়ে। সে বলে, আসেন ঘরে এসে বসে কথা বলেন।

'না। বসব না।'— আঁচলে চোখ মুছে কুসুম বলে। গল্পওয়ালা রেবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, ইনি হলেন দোকানি বাকের সাহেবের মিসেস। কী যেন সমস্যা হয়েছে এদের। আসেন না ভাবি আসেন।

'না। আমি যাই।'

'ঠিক আছে চলেন। আপনাকে দোকান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'— ঝোলাটা রেখে গল্পওয়ালা বের হয়ে যায় কুসুমের সঙ্গে। রাস্তায় কুসুম কোনো কথা বলে না অনেকক্ষণ। তারপর বলে, আপনার প্রত্যেকটা চিঠি আমি হাজার বার কইরা পড়ছি। সব মুখস্থ। কুসুম হঠাৎ দাঁড়িয়ে গড়গড় করে চিঠি থেকে মুখস্থ বলতে শুরু করে।

গল্পওয়ালা বুঝতে পারে— এই হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয়জাল। কথার ইন্দ্রিয়জাল। এই জালে মহিলা আটকা পড়েছে।

একটা ল্যাম্পোস্টের আলোয় আলোকিত নারীমূর্তিটির দিকে গল্পওয়ালা ভালো করে তাকায়। এবং আশ্চর্য যে, গল্পওয়ালার শরীরের মধ্যে, রক্তের মধ্যে কেমন উষ্ণতা জেগে ওঠে। মহিলা বলে, এই চিঠি যে লিখেছে, আমি তাকে

ভালোবাসি। তাকেই আমি মনপ্রাণ দিয়া রাখছি। আপনি কি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা?

'পারছি। ওই চিঠি আপনার স্বামীরই লেখা। ওনার কথাই আমি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিয়েছি মাত্র।'

'ওনার মনের কথাওয়ালা চিঠিও এইবার আমি পাইছি। আপনে লেখেন নাই। অন্য কেউ লেখছে। আমাকে উল্টাপাল্টা বুঝায়েন না।'

'চলেন। রাত হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আমি ক্লান্ত। চলেন। দোকানে চলেন।'

'শোনেন। আমি একা আসছি। আমি একাই যাবার পারবো। আপনাকে আর দরদ দেখানো লাগবে না। আপনে যান।'

'ঠিক আছে। আমি তো যাবোই। চলেন। ওই তো দোকানটা দেখা যাচ্ছে।'

'খবরদার। আপনি একপা আগাবেন না'— কুসুম খুব তেজি গলায় বলে। তার কণ্ঠ থেকে এমন কর্তৃত্ব ঝরে পড়ে যে, গল্পওয়ালা ভয় পেয়ে যায়। দোকানটা আর বেশি দূরে নয়, এখন ফেরা যায়— গল্পওয়ালা ঘরে ফিরে আসে।

এরপর থেকে কুসুমের আর কোনো খবর গল্পওয়ালা পায়নি। কিন্তু সে কুসুমকে ভুলতে পারে না। যখন একা থাকে, মনে মনে সে কুসুমকে চিঠি লেখে। প্রিয় কুসুম, কেমন আছো।

অন্যদিকে, রেবা তার দিকে তাকায় গোয়েন্দা চোখ নিয়ে, গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে। প্রথমত সেই রাতে সে গল্পওয়ালার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি, আর কোনো কারণ ছাড়াই সাধনের গালে বসিয়ে দিয়েছে দুই চড়। শরীর ভালো না বলে রাতের খাবার খায়নি। তারপরের দু'দিন গম্ভীর থেকে তৃতীয় দিনে প্রশ্ন তুলেছে, মহিলার সাথে তোমার রং ঢং কতো দিনের?

'কোন মহিলা?'

'অভিনয় করতে হবে না। ওই যে দোকানদারের বউ না কি।'

'না। পরিচয়-টরিচয় নেই তো। সেদিনই প্রথম এসেছেন।'

'তোমার কাছে কী চায়।'

'না। কিছু চায় না। এমনি এসেছিল।'

'এমনি। একটা পুরুষ মানুষের কাছে একটা মেয়ে মানুষ এমনি এমনি আসবে কেন? ফাজলামি নাকি!'

'এমনি মানে স্বামীর সাথে সমস্যা হয়েছে, এসেছে।'

'স্বামীর সাথে সমস্যা হলেই কি পরপুরুষের সাথে ঢলাঢলি শুরু করে দিতে হবে?'

'ঢলাঢলি আবার করলো কার সাথে।'

'ও সাধুপুরুষ। কিছু বোঝো না। আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাবো। তারপর যা খুশি করো। যাকে খুশি নিয়া এসে ঘরে তোলো।'

গল্পওয়ালা বিরক্ত হয়। এমনিতেই সে বড়ো পরিশ্রান্ত থাকে ইদানীং। একেবারেই বিশ্রাম নেওয়ার সময় পায় না। দিনের বেলা ফেরি করে গল্প বেচা, আর রাতের বেলা গল্প তৈরি করা। আগে তবু বেশ কিছু গল্প ঝোলায় জমা ছিল। এখন আর গল্প জমে টমে থাকে না। দিন আনি, দিন খাই অবস্থা। ফলে রোজ রাতেই গল্প বানাতে হয়। রাতে সে যতোগুলো গল্প বানায়, পরের দিনেই তা বিক্রি হয়ে যায়। এমন ব্যস্ততার মধ্যে কি ভালো লাগে এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নবাণ।

অহেতুক ঝগড়া।

অহেতুক! ও গল্পওয়ালা। সাধু সাজছো! ওই মহিলাকে চিঠি লেখার সময় তুমি তাকে তোমার মনের মন্দিরে দেবী বানিয়ে তারপর শব্দার্ঘ্য নিবেদন করোনি? তারপর সেইরাতে, লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে, কুসুমের আঁটোসাঁটো শরীরের দিকে তাকিয়ে তুমি লোভাতুর হয়ে পড়োনি।

নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে গল্পওয়ালা। ধুসশালা। কিচ্ছু ভালো লাগেনা। কেন করছি এসব। গল্পওয়ালা আর সে-রাতে একটাও গল্প বানাতে পারে না। ফলে পরের দিন ফেরি করতে বের হওয়াও হয় না তার। সে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে দিনমান।

তার ছোট্ট ছেলে সাধন বার বার আসে তার কাছে। 'বাবা, একটা গল্প বলো।' 'বাবা, চলো লুকোচুরি খেলি।' বাবা এসব প্রস্তাবের কোনো জবাব দেয় না। দুপুর বেলা, গোলযোগটা ঠিকভাবে বাধছে না দেখে, সে ঘোষণা দেয় যে সে কিছু খাবে না। স্বামীকে বেশ কিছুদিন পর ঘরে পেয়ে এদিকে রেবা বেশ মন দিয়ে ভালো কয়েকটা পদ তৈরি করে। 'না। আমি খাবো না। খিদে নেই'— গল্পওয়ালা যখন এই ঘোষণা দেয়, তখন বেধে যায় তুমুল ঝগড়া। তারপর কান্নাকাটি। রেবা সেই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে গল্পওয়ালা তাকে আদর করে রাগ ভাঙাতে উদ্যোগী হয়। তারপর, দুপুরবেলা, সাধন ঘুমিয়ে পড়লে গল্পওয়ালা রেবাকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেওয়ার সংকল্প করে।

আদর করতে গিয়ে গল্পওয়ালা এক সময় আবিষ্কার করে— সে ঠিক রেবাকে আদর করছে না কি কুসুমকে— আলাদা করা যাচ্ছে না।

রেবার ওপরের ক্ষোভ-অভিমানটা সে, অতঃপর পরিকল্পনা করেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

৫

গল্পওয়ালার এখন খুবই কদর। রাস্তায় কিশোর-কিশোরীরা দাঁড়িয়ে থাকে গল্প কেনার জন্য। আর দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। তারা তাকে জানাতে চায় নিজেদের জীবনের দুঃখের কাহিনীগুলো। গল্পওয়ালা অবশ্য এই বৃদ্ধদের সযত্নে এড়িয়ে চলে।

বৃদ্ধেরা তাকে প্রায়ই জোর করে আটকে রাখার চেষ্টা করে। তাকে গল্প শুনতে তারা বাধ্য করতে চায়। প্রত্যেক বৃদ্ধই মনে করে, তার জীবনের গল্পটিই সবচেয়ে অনবদ্য গল্প। আহা, এটা যদি লিখে ফেলা যেতো! গল্পওয়ালা তাদের বোঝায়, সৃষ্টি করবে যে, বেদনাও ভোগ করতে হবে তাকেই। অন্যের জীবনের বেদনা ধার নিয়ে কেউ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আপনার গল্পটি আপনাকেই লিখে ফেলতে হবে। বৃদ্ধেরা তার এই যুক্তি মানতে চায় না। তারা তাকে শাপ-শাপান্ত করে। কেউ কেউ তাকে বড়ো অঙ্কের টাকা সাধে। কিন্তু গল্পওয়ালা বৃদ্ধদের সঙ্গ তেমন পছন্দ করে উঠতে পারে না। তার পছন্দ কিশোর-কিশোরীদের। এরা খুবই প্রাণবন্ত কৌতূহলময়। জানার আগ্রহে তার টগবগ করে ছুটছে, আর পৃথিবীর দূষণ এখনো তাদের অন্তরের নিষ্পাপতাকে কলুষিত করতে পারেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা— এই কিশোরদের জন্যে অকৃত্রিম কোনো কিছুই নেই এই শহরে— না গল্প, না আনন্দ। যা আছে সবই যান্ত্রিক, সবই বিদেশাগত। বিদেশী প্রতীকগুলো এসে ভরে ফেলছে এ শহরের শিশুদের কল্পনার রাজ্য। সে জায়গায় দেশী চরিত্র দেশী প্রতীকের পুনরাবিষ্কারের কাজটি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গল্পওয়ালা নিজেই বোঝায় নিজেকে। তবে সে তার গল্পের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও বিক্রির কমতি নেই। সেটা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। লোকে এখন তাকে দামী গল্পওয়ালা বলবে।

গল্পওয়ালা হাঁটছে একটা গাছে ঢাকা রাস্তা দিয়ে। দুপাশে একতলা দোতলা বাড়ি, আর রাস্তাটা প্রশস্ত, ফুটপাত আছে। নির্জন বেশ জায়গাটা, কেমন ছায়া ছায়া। এ শহরে এমন কোনো জায়গা আছে নাকি!

এ পাড়ায় গল্পওয়ালা এসেছে আজ প্রথম। এই রাস্তায় কেউ তাকে চিনবে না। আজ হয়তো তাকে বেশ খানিকক্ষণ চাই গল্প চাই গল্প বলে হাঁকাহাঁকি করতে হবে। তবু সে পুরোনো পথে না হেঁটে আজ বেছে নিয়েছে নতুন পথ। এটা সে কেন করলো? গল্পওয়ালা ঝোলা কাঁধে হাঁটে, আর ভাবে। আসলে মানুষের স্বভাবই হলো নতুনের দিকে ধাওয়া করা। যে বই তোমার পড়া হয়ে গেছে, সেটি নয়, তোমার নজর থাকবে যেটি পড়া হয়নি সেটির দিকে। অপ্রাপণীয়ার জন্যেই কাতর থাকবে সব পুরুষ। যে পাড়ায় তার নাম হয়ে গেছে, সেই পাড়া ছেড়ে অন্য পথে হাঁটার মূলেও

আছে এই বোধ, এই প্রবৃত্তি। একটা নতুন পাড়ায় নিজের নাম হোক, পসার হোক। ভাবতে ভাবতে নীরবে বেশ খানিকটা পথ হাঁটা যায়। চাই গল্প বলে চিৎকার করার কথা মনে থাকে না। হঠাৎ এক অর্বাচীন কণ্ঠের জিজ্ঞাসা— 'আপনি গল্পওয়ালা না'...। শুনে সে সম্বিত ফিরে পায়।

'ঠিক চিনেছি, আপনি গল্পওয়ালাই।' বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে, বেশ মোটা-সোটা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। ঘামে তার শরীর ভিজে জবজবে।

'কী করে জানলে আমি গল্পওয়ালা।' 'বারে, আপনাকে চেনা খুব কঠিন নাকি। যে কেউই আপনাকে চিনতে পারে। আপনার চোখের নিচে কালি আর চুলগুলোর মধ্যে এমন দুঃখ দুঃখ ভাব— এমন লোক এ শহরে বুঝি আর একটিও আছে!'

'তাই বুঝি! তোমার তো খুব গরম লাগছে। ঘেমে গেছো! ঘাম বসে গিয়ে ঠান্ডা লেগে যাবে না! তখন তুমি আইসক্রিম খেতে পাবে না!'

'দৌড়ে এসেছি তো আপনাকে ধরতে। তাই ঘেমে গেছি।' ছেলেটা লজ্জা পাওয়া গলায় বলে।

'দৌড়ে এসেছো? তা হলে তো বেশ দূরে ছিলে। এতোদূর থেকে তুমি আমার চুল আর চোখের নিচের কালি দেখতে পেয়েছো?'

'না। তা পাইনি। কাঁধে ঝোলা, এমন দুঃখী আর মায়াকাড়া হাঁটার ভঙ্গি, এইসব দেখে আঁচ করেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কী, আমি রোজ রোজ আপনার আশায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। একদিন দুইদিন ভুল করে অন্য ফেরিওয়ালার পেছনেও দৌড়েছি। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝেছি, আপনি নন।'

'ও। আচ্ছা। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনেছো কার কাছে!'

'ওমা। আপনার কথা তো সকলেই জানে। আপনার গল্প আমার বন্ধুদের যারা কিনেছে, তারা তো সবাই আপনার জন্যে একেবারে পাগল প্রায়।'

'তাই!'

'হ্যাঁ। একটা কথা! আমি যে আইসক্রিম পছন্দ করি, সেটা বুঝলেন কী করে! আপনি কি সবার মনের কথা পড়তে পারেন।'

'না, শুধু যারা আমাকে ভালোবাসে, তাদেরকে পড়তে পারি।' এইবার গল্পওয়ালা একটুখানি সত্য গোপন করে। ছেলেটার স্বাস্থ্য ভালো দেখে সে অন্ধকারে ঢিল ছুড়েছে, আইসক্রিমের ব্যাপার ধরতে পারাটা একটা কাকতলীয় ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই না।

'গল্পওয়ালা আংকেল! আপনি কি আমাকে একটা রাজার গল্প শোনাতে

পারবেন।'

নিজের ঝোলাটার অবস্থা একটু ভেবে নিয়ে গল্পওয়ালা বললো, 'পারবো।'

'কতো দাম পড়বে।'

'দুশো টাকা! রাজার গল্প তো আমি বেচি জলের দরে।'

'আচ্ছা। দিন তো!'

'দুইশ টাকা পকেট থেকে বের করে ছেলেটা গল্পওয়ালার হাতে দেয়। গল্পওয়ালাও তার হাতে দেয় গরম গরম একটা গল্প। কাষ্ঠরাজার গল্প। ছেলেটা সেটা নিয়ে দৌড়ুতে থাকে। নিজের ঘরে গিয়ে সে সুতোয় টান দেয়, শুরু হয় অলৌকিক সেই গল্পবয়ান—

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার নাম ছিল কাষ্ঠরাজা। তার ক্ষমতার উৎস ছিল তার ডান হাতের তর্জনী। সে যে জায়গাতেই ডানহাতের তর্জনী ছোঁয়াতো, সে জায়গাই হয়ে পড়তো কাঠের। ইচ্ছে করে তর্জনী বুলিয়ে সে কাঠে পরিণত করলো সিংহাসন। তার হাতের ছোঁয়া লেগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কাঠে পরিণত হয়ে গেলো রাজপ্রাসাদ। আর ঘোড়াশালের সবচেয়ে তেজি টগবগে শাদা ঘোড়াটায় একদিন হঠাৎই লেগে গেলো তার তর্জনী। অমনি সেটা হয়ে গেলো কাঠের ঘোড়া। তখন দুঃখে রাজা ছিঁড়তে লাগলো নিজের চুল। আর তার চুলের যে অংশে অংশে তর্জনীর ছোঁয়া লাগলো, সেই অংশটুকু পরিণত গেলো কাঠের চুলে।

রাজা তখন খুঁজতে লাগলো উপায়। কী করা যায়। কী করা যায়। রাজার পাত্রমিত্র অমার্ত্যেরা সবাই ভাবতে লাগলো। শুরু হয়ে গেলো ভাবার প্রতিযোগিতা। ভেবে কি আর সমস্যার সমাধান বের করা যায়।

তখন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, কষ্ট করে ভেবে টেবে সমস্যার সমাধান করার দরকার কী? এর চেয়ে এই উদ্ভট রাজাকে সরিয়ে দিলেই তো হয়।

রাজার গুপ্তচর রাজাকে জানালো এই দুঃসংবাদ। আপনার সভাসদদেরই কেউ কেউ উল্টো-পাল্টা ভাবছে। রাজা দেখলেন, ভারি বিপদ তো। তিনি তখন ডাকলেন পাত্র-মিত্র-অমার্ত্যদের। তাদের প্রত্যেককে ছুঁয়ে দিলেন তার ডান হাতের তর্জনী। আর অমনি সবাই হয়ে গেলো কাঠের পুতুল। রাজা তার নাম দিলেন রাজ্য সংসদ। এখন সেটা হয়ে গেলো তার ইচ্ছার অধীন। মন্ত্রীদের ডেকে ডেকে তিনি ছোঁয়ালেন করাঙ্গুলি। মন্ত্রীরাও সবাই হয়ে গেলো কাঠের পুতুল।

কিন্তু তখন বিপদ দেখা দিলো সৈন্যদের তরফ থেকে। তারা ভাবলো, আমরা হলাম জ্যান্ত সৈনিক। আর ওরা হলো কাঠের মন্ত্রিসভা, কাঠের সংসদ।

আমাদের কর্তব্য হলো এদের সবাইকে উৎখাত করা। সৈন্যশাসন জারি করা। তখন রাজা ডাকলেন সেনাপতিকে। আর তাকে ছুঁয়ে দিলেন তার সেই আঙুল, অমনি সেনাপতিও হয়ে গেলো কাঠের সৈনিক।

সৈন্যেরা যখন ঘুমিয়ে রইলো শিবিরে, রাত্রিবেলা, রাজা চুপিচুপি গেলেন সেখানে। তারপর একটার পর একটা সৈন্যের গায়ে বুলিয়ে দিলেন তার জাদুকরি আঙুলটি। তখন সব সৈন্য পরিণত হলো কাঠের সৈন্যে।

আর কোনো বিপদ নেই। রাজা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বিপদ সংকেত বেজে উঠলো। বিদ্যামন্দির থেকে সব অধ্যাপকেরা বিবৃতি দিতে লাগলেন এই কাষ্ঠল শাসনের বিরুদ্ধে। তারা রাজার কাজের ভুলত্রুটির সমালোচনা শুরু করলেন শতমুখে, চুন থেকে পান খসবার উপায় পর্যন্ত রইলো না। রাজা বললেন, যারা যারা আমার স্নেহ পেতে চাও, আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি তোমাদের দেবো দেশের সেরা বিদ্যামন্দিরের আচার্যের পদ, দেবো এখানে ওখানে নানা একাডেমির পরিচালকের সম্মান, আর তোমাদের নিয়ে যাবো মৃগয়ায়।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে সব প্রতিবাদী বুদ্ধিসুন্দরেরা ভিড় করলো রাজদরবারে। রাজা সবাইকে আশীর্বাদ করলেন নিজ হাতে, প্রত্যেকের মাথায় বুলিয়ে দিলেন স্নেহের করস্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গে সব চিন্তাবিদদের মগজটুকুন পরিণত হয়ে গেলো কাঠে।

সবদিক থেকে রাজা এখন বিপদমুক্ত।

দেশে উন্নতির জোয়ার বয়ে যেতে লাগলো।

এমনকি বিদেশী সৈন্যের আক্রমণ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারলো না সামান্য বিপদ। কারণ রক্তমাংসের শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি হলো কাঠের সৈন্যেরা, তরবারির আঘাতে তারা টলেও না, কাতরায় না। তাদের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো শত্রুরা।

তবু এই রাজা চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে পারলো না। হায়, সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল।

এই রাজ্যে এলো এক জোড়া অতি ক্ষুদ্র ঘুনপোকা। এতো চমৎকার সব কাঠখাদ্য দেখে তাদের খুশি আর ধরেনা। তারা কুরে কুরে খায় সিংহাসন, রাজপ্রাসাদ, আর বংশবৃদ্ধি করে মনের সুখে। খুব তাড়াতাড়িই ঘুন পোকার সংখ্যা-বিস্ফোরণ ঘটে গেলো।

ঘুনপোকা গেলো মস্তিষ্কজীবীদের কাঠের মগজে। কুরে কুরে খেয়ে তাদের মাথাটাকে পরিণত করলো নিছক খোলসে। ভেতরে কিছুই নেই, বাইরে থেকে দেখা

যায় দশাসই মস্তক।

তাদেরই বুদ্ধিপরামর্শে চলতে লাগলো রাজ্য।

কতোদিনই বা চলতে পারে এভাবে।

একদিন ধড়াম করে ভেঙে পড়লো সিংহাসন। ঘুনপোকারা একেবারে ঝাঁঝড়া বানিয়ে ফেলেছিল সিংহাসনটাকে। আর তাতে বসা ছিলেন স্বয়ং রাজা। কিন্তু রাজা যেই ধপাস করে পড়লেন, অমনি তার ভেতর থেকে বেরুতে লাগলো কাঠের হলুদ মিহি গুঁড়া। হায় হায়, ভেতরে কিচ্ছু নেই। পুরোটাই খেয়ে ফেলেছে ঘুনপোকায়।

এইভাবে কাষ্ঠরাজা গেলো, কাষ্ঠমন্ত্রী গেলো, কাষ্ঠসংসদ গেলো, কাষ্ঠসৈন্যবাহিনী গেলো— সব কিছুই গেলো বাতিলের তালিকায়।

তখন রক্ত-মাংসের মানুষেরা এসে কায়েম করলো সপ্রাণতার রাজত্ব।

৬

কুসুম কিন্তু সে-রাতে তার স্বামীর দোকানেই ফিরে গিয়েছিল।

আর আশ্চর্য, রাতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাকের নামের লোকটা, তার স্বামী, অশিক্ষিত ও স্থুল, ও লম্পট, যখন তাকে আদর করার নামে আগ্রাসী তৎপরতা শুরু করে, কুসুম তাতে বাধা দেয়নি।

সে শুধু মনে মনে জপ করেছে— গল্পওয়ালা, গল্পওয়ালা।

মনের গভীরে উচ্চারিত এই নাম, ভাগ্যিস দোকানের ভেতরে তখন কোনো বাতি ছিল না, নইলে কে জানে— বাকের তার মুখ দেখে ফেললে অন্তরটা পড়ে ফেলতে পারতো কিনা, বোধ হয় পারতো না, আর পারলেই বা কী— সে কি বাকেরকে পাত্তা দেয় নাকি।

আর বাকের, বাঘের মতো উন্মত্ত, গোঁ গোঁ করছে, শিকারের ঘাড় মটকানো শেষে রক্তপান করে উদরপূর্তির আরামে ঘুমিয়ে পড়লো।

কুসুম ঠিক করেছে, সে এই শহরেই থাকবে। এই দোকানেই থাকবে।

কারণ এই শহরে গল্পওয়ালা আছে।

এই দোকানের সামনে দিয়ে গল্পওয়ালা যায়।

আর কুসুমের কী যে হয়, তার মাথার মধ্যে সারাক্ষণ খেলা করে তিন বছরে পাওয়া ৩৬ খানা গল্পওয়ালার চিঠি। সবগুলো চিঠি তার মুখস্থ। তবু, যখন সুযোগ পাওয়া যায়, ওই চিঠিগুলো বের করে সে পড়তে থাকে। বারবার পড়ে। তবু আশ মেটে না। প্রতিটা অক্ষর, প্রতিটা কমা আর দাঁড়ি, যেন একটা বকুল ফুল, তার আছে

নিজস্ব সৌরভ, সে সব উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে এসে তার মস্তিকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারপর তাকে নিয়ে খেলতে থাকে, তাকে হাসায় কাঁদায় স্বপ্ন দেখায়, তাকে তুলোর মতো ওড়ায়, ঘুনের মতো কাটে, তুষের মতো পোড়ায়। আর যেন সে, পরিণত হয় ক্লেদজ কুসুমে। এই ঘুপচি ঘরে থাকা, গণ-কলতলায় স্নান, আর বাকেরের সঙ্গে রাত্রিবাস— এর মধ্যে পড়ে থেকেও সে আরাধনা করে সুন্দরের, সৌন্দর্যের। বাকেরের অর্থাৎ গল্পওয়ালার লেখা চিঠিতে জ্যোৎস্নার যে বর্ণনা আছে— ফাল্গুনের রাত, দক্ষিণ দিগন্ত খুলে দিয়েছে তার জানালা, আস্তে আস্তে ফুলের ফুটে ওঠার মতো জেগে উঠছে সমীরণ, বইতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে, আর সে মৃদুমন্দ বাতাসের গায়ে গা ছেড়ে দিয়েছে চাঁদ, তাকে রাজদরবারের পাখা-বরদারের মতো পালকের পাখায় বাতাস করছে শাদা মেঘ, আর তারা ছুটে যাচ্ছে অজানার দিকে, যেন বা তারা রানার, চাঁদের চিঠি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে নানান ঠিকানায়, দোরে দোরে— একটা চাতকপাখি, চাঁদের থেকে যে অনেক দূরে, চাঁদের চেয়ে যে অনেক তুচ্ছ, চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে, এ এক বিভ্রান্ত চাতক পাখি, জল নয়, তার আরাধ্য জ্যোৎস্না।

হায়! আমি হলাম সেই চাতকপাখি— বিভ্রান্ত, বেচইন।

কুসুম দোকান ঘরের পেছনে বসে রান্না করে, পেঁয়াজ কোটে, পেঁয়াজের ঝাঁঝে তার চোখে জল এলে সে কাঁদতে বসে; অশ্রুর প্রবাহ অবাধ ও অনর্গল, তাতে সে আরাম বোধ করে; ঠিক সন্ধ্যার পরপর সে দোকানের পিছে একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে দাঁড়ায়, তার হাতে থাকে পানির কলস। যেন সে পানি আনতে যায়। ওই সময় গল্পওয়ালা ফেরে, লাইটপোস্টের নিচে পড়ে আছে আলোকখন্ড, তার নিচ দিয়ে যখন ক্লান্তপায়ে গল্পের ঝোলা হাতে লোকটা শ্লথ গতিতে যায়, খুব কাছে থেকে তখন তার দিকে তাকিয়ে থাকে কুসুম। তার সমস্ত শরীর কাঁপে, শরীর অবশ বিবশ হয়ে যায়, তার ভালো লাগে। ভীষণ ভালো লাগে।

এতোটুকুই চায় সে গল্পওয়ালার কাছে। আর কিছুই চায় না।

তারপর গল্পওয়ালা চলে যায় তার বাড়ির দিকে, অন্ধকার তাকে অন্তর্হিত করে; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুসুম চলে কলতলায়। কলসে জল ভরে।

তার স্বামী বাকের তাকে বলে, কুসুম, বাড়ি যাও। এইখানে কষ্ট কইরা কদ্দিন থাকবা।

'না। বাড়িতে যাবো না। এইখানেই ভালো।'

'তাইলে একটা বাসা লই। মাস্তানের গলিতে একটা ছাপড়া লই, ভাড়া পড়বো কম। সেইহানে থাকো।'

'না। আমি এ দোকানেই থাকতে চাই। আমার বাসা লাগবো না।'

'না না। সেকি। তুমি জোয়ান মাইয়া লোক। কলতলায় গোসল করো। বেপর্দা হয় ব্যাপারটা। দূর থাইকা পোলাপানরা তোমারে দেখে। আমার দোকানে কতগুলান খেলনা দূরবীন রইছিল। তুমি আসার পর সবগুলান বিক্রি হইয়া গেছে। আমি তো প্রথম প্রথম বুইঝা উঠতে পারি নাই— পোলাপান খালি দূরবীন কিনে ক্যান। পরে গোয়েন্দা লাগাইলাম। তখন বুঝলাম, তুমি যখন গোসল করো, পোলাপান চাইরদিক থাইকা দূরবীন ফিট কইরা তোমারে দেখে।'

'দেখুক। দেখলে তো শরীলের মাংস খুইলা পড়ে না।'

'পড়ে না। কিন্তু পাপ হয়।'

'দেখলে পাপ হয়। ওরা বোঝে না। কী জানি ওদের কপালে কী দুঃখ আছে।'

'আমি ওদের কথা কই না। কই তোমার কথা। তোমারও তো পাপ হয়।'

'ও। আমার পাপ হয়। আমি কি ওদের শরীলে হাত দিছি? বেগানা পুরুষ মানুষ বেগানা মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিলে পাপ হয় না?'

'তুমি যে কী কও। বুঝি না।'

'থাক। তোমার বুঝে কাম নাই। তুমি একটা কাজ করো বরং। আমাকে একটা ভালো দূরবীন দ্যাও। দামী দূরবীন। খেলনা দূরবীন না।'

'ক্যান? দূরবীন দিয়া তুমি কী করবা?'

'আছে। কাজ আছে। চাঁদ দেখবো, পাখি দেখবো, মেঘ দেখবো...। কুসুমের স্বর অন্যরকম শোনায়। খুবই অন্যরকম। বাকের দোকানদার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারে না।

তবে একটা দূরবীন সত্যি সত্যি সে এনে দেয়। খেলনা দূরবীনই তবে আরেকটু শক্তিশালী। তা পেয়ে কুসুম এতো খুশি হয় যে, বলার মতো নয়।

আজ সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেছে কুসুমের। রাতেও যে খুব ভালো ঘুম হয়েছে, তা নয়। দূরবীন পেয়ে সে খুব খুশি। বাকেরকে খুব আদর করে কাল রাতে ভাত খাইয়েছে। নিজে মাছের কাঁটা বেছে দিয়েছে। তারপর তাকে নিয়ে গেছে খোলা আকাশের নিচে। বলেছে, আসেন, আমরা নক্ষত্র দেখি।

'সেইটা আবার কী?'

'আকাশের তারা গো। আকাশের তারা।'

আকাশে খানিক মেঘ ছিল। আবার কিছু অংশ পরিষ্কারও ছিল। কুসুম আকাশের দিকে তাকায়। হায় হায়, এযে এক অন্যজগত। তারাগুলো কাছে চলে আসে।

'আসো, দ্যাখো। চোখ বন্ধ করো।'

বাকের আসে। দুই চোখ একসঙ্গে বন্ধ করে।'

'দুই চোখ না। এক চোখ বন্ধ করো। এই চোখ দিয়া দেখো।'

বাকের একসঙ্গে দুই চোখ বন্ধ করতে পারে না। কুসুম তার বাঁ চোখ টিপে ধরে। ডান চোখে দূরবীনটা লাগায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে বাকের বলে, আমার ঘুম পাইতাছে। সারাদিন যে ধকল গেছে।

বাকের এরপর ঘুমিয়ে পড়েছে। কুসুম আর ঘুমোয়নি। আকাশের তারা দেখেছে। একদম মাথার ওপরে নেমে আসা মেঘপুঞ্জ দেখেছে।

তারপর দিনের বেলা তক্কে তক্কে থেকেছে, কখন গল্পওয়ালা এই পথ দিয়ে যায়।

গল্পওয়ালাকে একসময় দেখা যায়। কাঁধে সেই ঝোলা। কুসুম দূরবীন চোখে লাগায়। গল্পওয়ালা একদম কাছে চলে আসে। খুব কাছে। কুসুমের বুক কাঁপে, শরীর কাঁপে। লোকটাকে দেখে তার মায়া হয়, খুব মায়া হয়। তার মনে হয় সে ছুটে যায়। তার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দেয়। তার চোখের কোলের কালিটুকুন নিজ হাতে মুছে দেয়। তার পায়ের কাছের ছায়াটায় ছায়া হয়ে শুয়ে পড়ে।

কুসুমের কথা গল্পওয়ালা ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু শেষতক আস্ত কুসুম চোখের মধ্যে পড়ে গেলে, তাকে ভোলাটা কঠিন হয়ে পড়ে। সেদিন রাতের বেলা, গল্পওয়ালার ফিরতে দেরি হচ্ছিল। কুসুম, অন্ধকারে কলস হাতে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। ভদ্রলোকের আসতে তো এতো দেরি হয় না। সে তো রোজ রোজ তাড়াতাড়িই ফেরে। কুসুম এ লাইটপোস্ট থেকে ও লাইটপোস্ট পর্যন্ত হাঁটাহাটি করে। সেদিন ছিল লোডশেডিং, ফলে অন্ধকার, আর শহরের বাইরের এলাকাটা এখনো জনভারে কাতর হয়ে ওঠেনি। ফলে কুসুমের এই ছটফটানি কারো চোখে পড়েনি। আর রাস্তায় আলো না থাকায় কুসুম একদম রাস্তার ওপরেই চলে এসেছিল, কেননা দূর থেকে দূরবীন পাতলেও আজ কুসুম গল্পওয়ালাকে দেখতে পাবে না।

আসে না আসে না করে লোকটা এলো বেশ রাত করে। তখন, হঠাৎ তাকে পেয়ে কুসুম আর ধৈর্য্যের বাঁধ ধরে রাখতে পারে না। দৌড়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়, কান্না ভেজা স্বরে বলে— এতো রাত করে বাড়ি ফেরে কেউ?

গল্পওয়ালা কিন্তু প্রথম দফাতেই চিনতে পারে কুসুমকে। আশ্চর্য! এই অন্ধকারেও। বলে, কে কুসুম না?

'আর কুসুম। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরি, আর আপনার এতো রাত করে ফিরতে হয়।'

'কী ব্যাপার কুসুম।'

'ব্যাপার কিছু না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয় না? দিনকাল ভালো না। বিপদ-আপদের কথা বলা যায়!'

'কুসুম কি এখানেই আছো?'

'হ্যাঁ। আছি।'

'কেমন আছো?'

'কেমন আছি! ভালো আছি। ভালো আছি। তবু তোমাকে দু'বেলা দেখতে পাই। দেখো, তোমাকে দেখার জন্যে একটা দূরবীন কিনেছি। তোমার সংসার আছে, সন্তান আছে। তাই তোমাকে যন্ত্রণা দেই না। নিজে নিজেই দূর থেকে তোমাকে দেখি।'

গল্পওয়ালার শরীর ক্লান্ত। বাসায় ফিরতে পারলে সে বাঁচে। এই ধরনের নাটুকে সংলাপেও তার মনের মধ্যে খুব যে তরঙ্গ ওঠে, তা কিন্তু নয়। দুনিয়াটা বড়োই বিচিত্র, তার চেয়ে বিচিত্র তার মানুষ— কতো বিচিত্র প্রকারের মানুষেই না দুনিয়াটা ঠাসা। গল্পওয়ালা বিস্মিত হয় না। শুধু বলে, 'ঘরে যাও কুসুম। কেউ দেখে ফেলবে।'

'ঘর। ঘর কোথায়? ওই ঘর তো কাঁটায় ভরা। গল্পওয়ালা, আমি আর পারি না যে। তোমার লেখা চিঠিগুলো যখন পড়ি, তখন যে আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়।'

'ওই চিঠি তো আমার নয় কুসুম। ও দোকানদারের চিঠি।'

'না। আমি জানি।'

'বেশ। তবে ওই চিঠি আর পড়ো না। ছিঁড়ে ফেলো।'

'তাও ভাবছিলাম। আর পড়বো না। কিন্তু পারি না। কেমন নেশার মতো টান লাগে। স্থির থাকতে পারি না। ছুটে ছুটে যাই। কী সব লিখেছো তুমি।'

গল্পওয়ালা বোঝে, কথা সত্য। তার লেখার মধ্যে কোথায় একটা ইন্দ্রজাল আছে। সে ঠিক হয়তো স্বাভাবিক মানুষ না। তারওপর ওই চিঠিগুলো লেখার সময় সে একজন বিরহকাতর পুরুষ তার প্রিয়ার জন্যে যতোটা আবেগময় হয়ে উঠতে পারে, সে আবেগের সবটাই সে ঢেলে দিয়েছিল। বাকের দোকানদারের একটা কথাও সে শোনেনি। সত্যি কথা বলতে কী, তখন ওই অচেনা অদেখা নারীটির জন্যে এক ধরনের হাহাকার এক ধরনের প্রচণ্ড ভালোবাসা গল্পওয়ালা নিজে অনুভব করেছিল। সেই হাহাকার আর ভালোবাসায় ভরা একেকটি চিঠি। এগুলোর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা থাকতে পারে। এক ধরনের কুহক সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

'কুসুম। আজ এমনিতেই অনেক রাত হয়েছে। আজ যাই।'

'না। আমার আদর লাগবে। আমার অনেক আদর লাগবে।'

'পাগলামি করো না কুসুম। যেতে দাও।'

'ঠিক আছে। আজ যাও। কাল আমাকে একটা গল্প দিয়ে যেও।' কুসুম সরে দাঁড়ায়।

গল্পওয়ালা তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। বিদ্যুৎ চলে এসেছে। রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে। ভাগ্যিস। আরেকটু আগে বিদ্যুৎ এলেই তো সর্বনাশ হয়ে যেতো।

দরজা খোলে কাজের মেয়ে মর্জিনা। বয়স ১০ কি ১২। তার পিছে দাঁড়িয়ে আছে সাধন। সাধন বলে, 'বাবা, তুমি আজ আমাকে চুমু দিয়ে যাও নি।'

'ও তাই নাকি। ভুলে গিয়েছিলাম নাকি। তাহলে তো সত্যি ভুল হয়ে গেছে।' গল্পওয়ালা ছেলেকে কোলে নেয়। তার গালে চুমু দেয়।

'এতো দেরি করলা যে।' রেবা এগিয়ে আসে। তার হাতের থালায় ছেলের জন্যে ভাত। পরনে ড্রেস করে পরা শাড়ি। একটা স্ট্যান্ডিং ফ্যান ঘুরছে। বাতাসে তার শাড়ির পাড় কাঁপছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে গল্পওয়ালা বোঝার চেষ্টা করে পরিস্থিতি কেমন, আবহাওয়ার জন্যে কোনো বিপদ-সংকেত আছে কিনা। রেবার চেহারা অভিযোগহীন দেখায়। তবু গল্পওয়ালা মনের মধ্যে একটা চোর চোর ভাব খচখচ করে।

কুসুম নিঃশব্দ পায়ে তার ডেরার দিকে পা বাড়ায়।

বিদ্যুৎ চলে এসেছে। কিন্তু তবু দোকানে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলে কেন? আর বাকেরই বা কোথায়? দোকানের ঝাপ তুলে লোকটা এভাবে কোথায় যেতে পারে। হয়তো দোকানের পেছনে বসে পেচ্ছাব করছে।

কুসুম দোকানের পেছনে যায়।

ওইখানেই একটা চালার মতো আছে, যেখানে তার সারাদিন কাটে। বাঁশের বেড়া। বেড়ার ফুটোফাটা। দোকানের আলো এসে জায়গাটায় পড়েছে। পাশেই চুলা। চুলায় গরম পানি চড়িয়ে গিয়েছিল কুসুম।

বেড়ায় ফুটো দিয়ে কুসুমের চোখ আপনাআপনিই ভেতরে চলে যায়। দোকানের আলো আর চুলার আগুনে জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খুবই ছোট্ট পরিসর, লম্বা হয়ে শোয়ার উপায় নেই।

কুসুম দেখতে পায়, বাকের আর একটা নারী। বাকেরের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। পরনে লুঙ্গি নেই। আর মহিলাটার পায়জামা তার গোড়ালির নিচে পড়ে আছে। কুসুমের ধারণাশক্তি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে— এটা ওই ছেমড়িটা। সেদিন এই হারামজাদির শরীর নিয়েই বাকের হারামজাদা কচলাকচলি করছিল। কুসুমের মাথায়

আগুন জ্বলে ওঠে। 'ওরে কুত্তার বাচ্চা' বলে সে চিৎকার ছাড়ে। হাতের ভরা কলসি হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়। বেড়ার গেট খুলে কুসুম ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গমোদ্যত নারীটির ওপরে। কুসুমের পেটানো শরীর। হাতে-পায়ে অসুরের শক্তি। এক ঝটকায় ছেমড়িটাকে ছুড়ে ফেলে দেয় বেড়ার ওপর। তারপর বেধড়ক চালাতে থাকে লাথি ঘুষি। মেয়েটির দু'পায়ে বেড়ি হয়ে আছে পায়জামা। সে কী করবে ঠিক বুঝতে পারে না। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তার হাত চলে যায় কুসুমের চুলে। সে চুল টানে, মুখে আঁচড় কাটতে থাকে।

লুঙ্গি খুঁজে পরে বাকের অকুস্থল ত্যাগ করে।

মেয়েটিকে মারতে মারতে হয়তো মেরেই ফেলতো কুসুম। বাঁশের বেড়া মড়মড় করে ভেঙে যায়। তখন অপর একটা নারীর বেআব্রু অবস্থা তার হুঁশ ফিরিয়ে দেয়। সে তাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে বসে।

রাত্রিবেলা বাকের আর ফেরে না। কুসুম নিজেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। মাথা আর কান দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে। মন-মেজাজ কিছুতেই ঠান্ডা হচ্ছে না।

টঙের ওপরে দোকানের কাঠের পাটাতন। পিঠের নিচে মাদুর। তিনদিকে চাল-ডাল-গুড়-বিস্কুট-চা-চিনির সমাহার। সে সবের মুদি-সুলভ গন্ধ। সেখানে একা একা শুয়ে কুসুম রাগে পা আছড়ায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল— কুসুম টের পায়নি। কিন্তু শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সেটা সে টের পায়— দোকানের মেঝেতে চিনি পড়েছিল, পিঁপড়া উঠেছে। কুটকুট করে পিঁপড়া কামাড়াচ্ছে। কুসুম উঠে বসে।

পাশে বাকের নেই। লোকটা কোথায় গেলো? হাঁটু ভাঁজ করে বসে তার ওপর মাথা রেখে পা চুলকাতে চুলকাতে নানা কথা ভাবে কুসুম। আচ্ছা, সে বাকেরের ওপর রাগ না করে ওই মেয়েটার ওপর হামলে পড়লো কেন? সে নিজেই তো অন্যের জন্যে দিওয়ানা হয়ে গেছে, বাকেরের জন্যে হৃদয়ের কোনো টান নাই, ভালোবাসা নাই— তাহলে ওই নারীটিকে কেন সে সহ্য করতে পারলো না?

মানুষের মন! খরস্রোতা গভীর নদীর ঘূর্ণির মতো। তাতে জল আর কাদা, ঘাস আর মাছ, কলাগাছ আর কাঠ, লাশ আর বাঁশ— কতো কিছু পাক খায়। ওই জলের গতি আর প্রকৃতিকে কে ব্যাখ্যা করবে?

মানুষের মনেও তেমনি বহু ধারা বয়ে যায়। চোরা স্রোতও তাতে প্রচুর। মানুষ কেবল কাজ করে, আর মুখে বলে, তাই নয়, সে মনে ভাবেও। তার বাইরেরটা দেখে ভেতরেরটা আন্দাজ করা যাবে না। সে ভাবে, সে বলে, সে করে। কিন্তু সবসময়

সে যা ভাবে, তা করে না। যা করতে চায়, তাও করে না। যা করছে, তা সে হয় তো করতে চাইছে না।

কুসুম ওঠে। পেছনের ছোট্ট কবাটটা খোলে। নিচে যায়। ঘুপচিতে পড়ে আছে বাকের। শোয়ার জায়গা নাই। একটা টুলের ওপর বসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কুসুমের খুব মায়া হয়। সে তার কাছে যায়। ঘুমন্ত স্বামীকে চুম্বন করে। তার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

বাকের জেগে ওঠে। চোখ মেলে চায়। অন্ধকারে প্রথমে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। রাস্তার আলোয় পরে টের পায় এটা তার বউ। বাকের কাঁদতে থাকে। তারপর বউটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। টুলটা নড়ে গেলে সে ধপাস করে পড়ে যায়। এতো ছোট্ট জায়গা। কুসুম বলে, চলো দোকানে চলো।

বাকের বলে, আমারে মাফ কইরা দিও কুসুম।

কুসুমের ভেতরে আবার রাগ জ্বলে ওঠে। তার শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। আবার সে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

তখন তার বেশ মায়া হয়। কয়েক ঘন্টা আগে সে একটা যুগলের মিলন ভেঙে দিয়েছে। অচরিতার্থ কামনা নিয়ে লোকটা কি বড়ো অশান্তিতে আছে?

কুসুম মমতামাখা স্বরে বলে, চলো, দোকানে চলো।

৭

সেই শহরটা ছিল এক হুজুগের শহর। যখন যে হুজুগ শুরু হয়, তাই নিয়ে একসঙ্গে লেগে পড়ে সমস্ত শহরবাসী। যে কোনো নতুন জিনিস তুমি বাজারে ছাড়ো, অমনি সারাটা শহর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তোমার পায়ের কাছে। সে চীনা-রেস্তরাঁর সুপের নামে ভাতের মাড়ই হোক, আর দক্ষিণী খাদ্যের নামে মাস কলাইয়ের গুঁড়োর দলা হোক— নতুন এসেছে শুনলেই শহরবাসীর জিভ ছোঁক ছোঁক করতে থাকে। অ্যাই তুই খেয়েছিস। ইস খাসনি, তোর তো জীবনই বৃথা— ইস, ইদলি, ওতো আমার জান।

সম্প্রতি শহরবাসী মেতে উঠেছে এক নতুন হুজুগ নিয়ে। প্যাকেজের হুজুগ। এখন তার সব কিছুতেই চাই প্যাকেজ। ট্যুরে যেতে চাও বনে বা সাগরে, আছে প্যাকেজ ট্যুর। কোচিং সেন্টারের আছে প্যাকেজ প্রগ্রাম, তাতে নানা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোচিং এক সঙ্গেই হয়ে যায় (সম্ভবত)। তবে সব প্যাকেজকে ছাড়িয়ে গেলো আকাশী প্যাকেজ প্রগ্রাম। ওটা নাকি আকাশে ছাড়া হয়, আর শহরবাসীর ঘরে ঘরে দেখা দেয় তারার ঝিলিক।

শহরবাসী আকাশী প্যাকেজ প্রগ্রাম নিয়ে রীতিমতো ক্ষিপ্ত উত্তেজিত। মাতোয়ারা। সবাই চললো আকাশী প্যাকেজ বানাতে।

গল্পওয়ালাকে এসে ধরে অনেকেই। একটা গল্প দেন— প্যাকেজ বানাই। গল্পওয়ালা ব্যাপারটা ধরতে পারে না। প্যাকেজ মানে তো মোড়ক। সে বিস্কুটের মোড়কও হতে পারে, মিষ্টির প্যাকেটও হতে পারে। সাধারণত ছাপাখানার সঙ্গে প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি থাকে। আরে খ্যাত্ নাকি? প্যাকেজ চেনে না। এক ফুল দো মালি। কাট। অ্যাকশন। কিডনির অসুখ। এক আছাড়ে স্মৃতিভ্রম, আরেক আঘাতে স্মৃতি পুনরুদ্ধার। ক্লিনিকে-হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের প্রেম। রোগী মানসিক ভারসাম্যহীন, মহিলা ডাক্তার তার সঙ্গে খেলে প্রেম প্রেম খেলা। দীপ নেভে নাই। সবার উপরে। নায়িকা উঠতি মডেল। নায়ক বিদেশ ফেরৎ। ব্যাক গ্রাউন্ডে বিদেশী মিউজিক। নায়িকা আর নায়ক হাঁটে। মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের কাপড় বদলায়। হাঁটে নাকি তার ক্যাটওয়াক করে। আইসাছে আইসাছে দেশে প্যাকেজের হুজুগ, তুমি আমি যাই চলো যাই এইতো সুযুগ। সুযুগ চলি যায়, তুমি প্যাকেজ বানাবা না। ও গল্পওয়ালা, গল্প দ্যান। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেন চলে যায়।

ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে গল্পওয়ালা। আকাশী প্যাকেজ জিনিসটা কী? তাকে বোঝানোর উদ্যোগ নেয় নির্মাতারা। উদাহারণগুলো দেখিয়ে দেওয়া হয়। আরে কী আশ্চর্য, নায়কের বাবা থাকে না, নায়িকার মা থাকে না। দি আইডিয়া। গল্পওয়ালা এক দুর্দান্ত শ্বাসরোধকারী প্যাকেজ গল্প বানিয়ে ফেলে।

গল্পের নাম— কার পাপে।

এক নওজোয়ান। তার নাম অনন্ত (প্যাকেজের নায়কের নাম এ রকম হয়)। আরেক উদ্ভিন্ন-যৌবনা। তার নাম নম্রতা (প্যাকেজের নায়িকার নাম এমন হওয়াই দস্তুর)।

অনন্ত সৌখিন ফটোগ্রাফার (প্যাকেজের নায়কেরা এ ধরনের আধুনিক কাজ করে থাকে)। আর নম্রতা আর্ট ইন্সটিটিউটে (অথবা আর্কিটেকচারে) পড়াশোনা করে।

অনন্ত একদিন সকালবেলা ভাবে, যাই না কেন, কিছু শীতকালের পাখির ছবি তুলে আসি। একটা মটর সাইকেলে উঠে সে গাঁয়ের উদ্দেশে বের হয়। তখন ধাম ধাম মিউজিক বাজে।

আর আর্ট ইন্সটিটিউটের নম্রতা ভাবে, আমার তো কিছু ল্যান্ডস্কেপ ড্রয়িং করা দরকার। আব্বু, চলো, তোমার খামার বাড়িতে।

নম্রতার মা নেই। মা-মরা মেয়ে। বাবার দু'চোখের মণি। মেয়ে যা বলে,

বাবা তাই শোনে। চল্ তাহলে যাই।

অনন্ত ক্যামেরা বাগায়। নদীর চর। পানিতে শাপলা। আর কতো পাখি। পাখিতে পাখিতে সয়লাব। আরে ক্যামেরার লেন্স অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে একটা ঝোপের অন্যপাশে কী যেন নড়ছে, সেদিকে ক্যামেরা ধরে অনন্ত। একটা ক্যানভাস। তাতে কয়েকটা পাখি। সেই পাখিতে ক্যামেরা প্রথমে ক্লোজ শটে ধরা হয়। তারপর আস্তে আস্তে তুলি, সঞ্চরণশীল হাত, সেখান থেকে একটা মুখ— নম্রতার। ক্লিক।

ওদিকে নম্রতা ঘুরে তাকায়। কে রে আমার ছবি তোলে— পারমিশন ছাড়া। অ্যাই, অ্যাই, আপনি কে? আমার ছবি তুলছেন কেন? পারমিশন নিয়েছেন?

'আজ্ঞে না, মানে আমি পাখির ছবি তুলছিলাম।'

'পাখির ছবি? তাহলে ক্যামেরা পানির দিকে না ধরে এদিকটায় ধরলেন কেন?'

'আমি ক্যানভাসের পাখি দু'টোকে ধরেছি কিনা?'

'ও। জীবন্ত পাখি রেখে এই ছবির পাখিই আপনার চোখে পড়লো।'

'পড়বে না! পাখি দু'টো আপনি যা এঁকেছেন, এতো সুন্দর, এতো জীবন্ত, মনে হচ্ছে ওরা এক্ষুণি ক্যানভাস ছেড়ে উড়ে চলে যাবে।'

'ও। তাই বুঝি।'

'না। শুধু সেটাই নয়। ওই পাখি দু'টোর ওপরে একটা হাত নড়ছিল। মনে হচ্ছিল, কোনো অপ্সরীর হাত!'

'খ্যাত্ নাকি? কাব্যদোষ নেই তো।'

'আরে না। আমি পড়ি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। আর ছবি তোলা, এ আমার পাস-টাইম।'

'এসব আমাকে বলছেন কেন?'

'বলে রাখি। কোনো উপকারে আসতেও পারে। যাক যা বলছিলাম, ওই অপ্সরীর হাত ফলো করতে গিয়ে দেখি— আরে এ যে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে সাপ।'

'কী! আমি কেউটে সাপ।'

'আরে না না। আপনি সাপ না। এটা একটা কথার কথা।'

'কথার কথা। কী সেই কথার কথা?'

'এ যে দেখছি, সত্যি সত্যি একটা অপ্সরার মুখ। এই সেই মুখ যাকে আমার ক্যামেরা দীর্ঘদিন খুঁজে ফিরছে।'

'শোনেন। ওই যে বাড়িটা দেখছেন, ওটা আমাদের বাগানবাড়ি। ওখানে দু'দুটো ইয়া মোটা ষণ্ডা ধরনের চৌকিদার আছে। ওরা বহুদিন হাত খুলে ধোলাই দেয়

না। আপনার মতো একটা সন্দেশটাইপ চেহারার লোকই ওরা খুঁজছে।'

'ছি ছি। আপনি না একজন আর্টিস্ট। আর্টিস্টরা কখনো এভাবে কথা বলে?'

'হ্যাঁ বলে। আমার আর্ট হলো মার্শাল আর্ট। দেখবেন?'

'না না। তা করবেন না।'

'আপনি কুকুরে ভয় পান?' নম্রতা বলে।

'খুব।'

'তাই নাকি। হাউ ফানি। এলিস এলিস।' নম্রতা বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

অমনি একটা কুকুর দৌড়ে আসে। কালো শরীর। লিকলিকে গা। চিকন লেজ।

'ওরে বাবারে'— অনন্ত দৌড় ধরে। তার দৌড় দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে কুকুর তার দিকে তেড়ে আসে। নম্রতা হাসতে হাসতে বাঁচে না।

কিন্তু অনন্তর অবস্থা খারাপ। ওরে মারে বাবারে করে সে লাফিয়ে পড়ে জলে। তখন সবগুলো পাখি একযোগে উড়াল দেয়। এলিস তীরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতেই থাকে।

অনন্তের পরনে ছিল টাইট জিন্স। সেসব ভিজে গিয়ে তার পা আটকা ধরে। হাড় কাঁপানো শীত। সে চিৎকার করে ওঠে— বাঁচাও, বাঁচাও।

'হায়! হায়! সাঁতার জানেন না।'

'না।'

'তাহলে।'

'আমি মরে যাচ্ছি। ও বাবারে, ও মারে আমি মরে যাচ্ছি।'

'তাহলে এখন উপায়?'

'এ জনমে আর আমাদের মিলন যখন হলো না, পরজনমে হবে। মরার আগে নাম ঠিকানাটা জেনে যেতে চাই। স্বর্গে গিয়ে খোঁজ করবো।' হাপুস হুপুস জল খেতে খেতে বলে অনন্ত।

'আমার নাম নম্রতা। আমি পড়ি আর্ট ইন্সটিটিউটে।'

'মার্শাল আর্ট ইন্সটিটিউটে?' এক ডুবে খানিক জলে খেয়ে আবার ভুশ করে জেগে উঠে সে বলে।

'না না। চারুকলায়।'

'ও। আমার নাম অনন্ত। আমি পড়ি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। আপনাদের ওখানেই। চলি, বিদায়। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।'

'অ্যাই কে কোথায় আছো, হেল্প হেল্প'— নম্রতা কাঁদতে কাঁদতে বলে।

'এলিসকে পাঠিয়ে দিন। ওই গার্ড দুজনকে ডেকে আনুক।' ডুবে যাওয়ার আগে বলে যায় অনন্ত।

'এলিস, গো, কল দি গাইস। গো। গো।' এলিস চলে যায়।

আরেকবার জেগে ওঠে অনন্ত। বলে 'প্লিজ। একটু হাত বাড়িয়ে দিন। নিদেন পক্ষে ওই দড়িটা।'

আরে তাইতো। একটা দড়ি পেঁচিয়ে আছে গাছের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি দড়িটা খুলে সে ছুড়ে মারে অনন্তর দিকে। অনন্ত দড়ি ধরে।

তখন হাম্বা বলে একটা গরু ছুটতে থাকে। দেখা যায় দড়ির অপর মাথায় আছে একটা গরু। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে ডাঙায় চলে আসে অনন্ত।

আবার গরুটা এদিকে ছুটে আসে। কালো গরুর তেড়ে আসা দেখে ভয়ে নম্রতা লাফিয়ে পড়ে পানিতে।

'বাঁচান, বাঁচান।' নম্রতা চেঁচায়।

অবশ্যই বাঁচাবো। অনন্ত আবার নেমে পড়ে জলে। ধরুন। ধরুন হাত ধরুন। তার এক হাতে গরুর দড়ি। অন্য হাতে নম্রতা। অনন্ত বলে, এই গরু হ্যাট হ্যাট।

নম্রতা বলে, এই গরু হ্যাট হ্যাট। গরু ওদিকটায় যায়। আর দড়িতে টান পড়তেই উঠে আসে নম্রতা আর অনন্ত। তখন হাঁটুজলে অনন্ত নম্রতাকে পাঁজাকোলা করে কোলে তোলে। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে পড়ে ডাঙায়। তারপর বলে, ভাগ্যিস আপনি কুকুরটাকে ডেকেছিলেন। নইলে আপনার শরীরের ছোঁয়া কি আর পাওয়া হতো!

তখন আবার কুকুরটা ছুটে আসে এদিকে।

ওরে বাবারে বলে অনন্ত আবার জলে ঝাঁপ দিতে যায়।

'অ্যাই করছো কী, করছো কী! এলিসকে আমি সামলাচ্ছি। এলিস, গো।' এলিস চলে যায়। গরুটা আবার এদিকটায় আসছে। নম্রতা জড়িয়ে ধরে অনন্তকে। অনন্ত উঠে ছবি আঁকার ক্যানভাস নিয়ে তাড়া করে গরুটাকে। গরুটা বিদেয় হয়।

তারপর বলা নেই কওয়া নেই ক্যাম্প ফায়ার। খোলা আকাশের নিচে কাঠখড় পুড়িয়ে আগুন জ্বালানো হয়। তখন গান শুরু হয়—

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
মনের বনে সবুজ বৃক্ষে
অনন্ত অনন্ত
নম্রতা নম্রতা

আমি তুমি, তুমি আমি

সোনার চেয়েও প্রাণটা দামি— হো-হো-হো।

ব্যাস নম্রতা আর অনন্তের প্রেম হয়ে যায়। তারা শপথ নেয়—একে অন্যকে ছাড়া বাঁচবে না।

(এদিকে নম্রতার বাবা, যিনি মেয়েকে বাগানবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আবার গিয়েছিলেন শহরে, তার ফিরতে রাত হবে, কিন্তু রাতে ফিরতে পারলেন না। মেয়ের হাতে মোবাইল ফোন ছিল, ফলে সে তথ্যটা তিনি জানিয়ে দিতে পেরেছেন।)

ছবি তোলা ছবি আঁকার পর্ব সেরে অনন্ত আর নম্রতা ফিরে আসে শহরে। ছেলের আছে শুধু মা, মিসেস হক। নম্রতার আছে শুধু বাবা, মিস্টার চৌধুরী। অনন্ত বলে, মা, আমি বিয়ে করতে চাই। মেয়ে ঠিক করে এসেছি। তুমি আলাপ করো।

মিসেস হক ফোন করেন মিস্টার চৌধুরীকে। আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। একটু চাইনিজ রেস্তরাঁয় আসতে হয়। শুনে মিস্টার চৌধুরীর বুক কাঁপে। কে এই নারী, কেন সে ফোন করে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

তারা দেখা করে এক চাইনিজ রেস্তরাঁয়। মিসেস হক বলেন, আমি কিন্তু একা। ওর বাবা মারা গেছেন ওর যখন বয়স সাত।

মিস্টার চৌধুরী বলেন, আমিও বড়ো একা। ওর মা মারা গেছেন, ওর জন্মের পরপরই। আর একাকীত্ব ভালো লাগে না।

'তাই তো। কতোদিন আর একঘেঁয়ে জীবন যাপন করা যায়। এবার একটা ধুন্দুমার লাগিয়ে দিন।'

'মানে।'

'মানে বিয়ে আর কী।'

'যাহ! কী বলেন?'

'কেন আমাদের ফ্যামিলি আপনার পছন্দ হয়নি?'

'হয়েছে।'

'তাহলে?'

'ঠিক আছে একটু ভেবে বলি। সাতদিন সময় দিন।'

'আচ্ছা। নিন সাতদিন সময়। আসলে হায়াত মউত রিজক দৌলত সব...'

সাতদিন যেতে হয় না। তার আগেই মিস্টার চৌধুরী ফোন করেন মিসেস হককে। চলে আসুন পাঁচতারা হোটেলের লাউঞ্জে।

তাদের দেখা হয়। দু'কাপ কফি আসে। কাপে দুধ ঢালতে ঢালতে চৌধুরী বলেন, মিসেস হক, আমি আবার চিনি খাই না। বাই দ্য বাই, আপনাকে আর মিসেস

হক বলছি না। নাম ধরেই ডাকবো। নামটা যেন কী?

'ছবি। সায়রা বানু ছবি।'

'ছবি। আমি রাজি।'

'আল হামদুল্লিাহ।'

'সত্যি ছবি, তোমার ফোন পাওয়ার প্রথম দিন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। নিশ্চয় এই বিয়ে আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে।'

'মানে কী। আমাদের বিয়ের কথা আসছে কোথা থেকে?'

'কেন? তুমিই তো বলেছো ছবি।'

ছবি চুপ করে যান। একটা ভুল হয়ে গেছে। কোথাও। ছেলে-মেয়ের বিয়ের কথাটা তিনি আর পাড়েন না। বলেন, মিস্টার, চৌধুরী, আমাকে দুটো দিন সময় দিন। দুটো দিন মিসেস হক অনেক ভাবেন। যতোই ভাবেন, ততোই অচেনা পুলকে তার শরীর মন কেঁপে কেঁপে ওঠে। তাই তো। তারও এটা মন আছে। একটা শরীর আছে। আজ তার ফুলের বনে এমন আগুন এনে দিলো কে?

দুইদিন পরে তিনি ফোন করেন চৌধুরীকে, আমি রাজি।

তখন ছেলে বলে, মা, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলেছো।

'হ্যাঁ। সেই সব নিয়েই তো চৌধুরীর সঙ্গে প্রায়ই কথা হচ্ছে। আজো আমি যাচ্ছি সেই সব নিয়েই কথা বলত।'

তারা যান এক নীল দরিয়ায়। সুন্দর ছোট্ট জাহাজ ভাসিয়ে তারা গান গান। এদিকে নম্রতাও বসে থাকার পাত্র নয়। সে বাবাকে বলে, বাবা, আজ আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।

'কোথায় মা?'

'আগে চলো। আমার বয়ফ্রেন্ডের বাসায়। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।'

'আচ্ছা।'

নম্রতা তার বাবাকে নিয়ে হাজির হয় অনন্তর বাসায়। অনন্ত বাসায় ছিল। তখন চার চরিত্র, মিস্টার চৌধুরী আর মিসেস হক, নম্রতা আর অনন্ত মুখোমুখি।

চৌধুরী বলেন—'ছবি, তুমি?'

মিসেস হক বলেন, মিস্টার চৌধুরী, তুমি?

'তোমরা নিজেদের চিনতে নাকি?' নম্রতা বলে।

চৌধুরী বলে, 'হ্যাঁ, আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি, আমরা বিয়ে করবো

বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'বাহ্‌বা মিস্টার চৌধুরী, বাহ্‌!'— নম্রতা বলে।

'চমৎকার মিসেস হক, চমৎকার'— অনন্ত সংলাপ ঝাড়ে।

'তোমাদের বিয়ে হচ্ছে না, বাবা'— নম্রতা ঘোষণা দেয়।

'খামোশ'— চৌধুরী মেয়েকে চড় লাগিয়ে দেয়।

'খবরদার, নম্রতার গায়ে হাত তুলবেন না'— অনন্ত গর্জন করে।

'বিয়ে আমরা করবোই'— মিস্টার চৌধুরী আর মিসেস হকের যৌথ ইশতেহার।

'বিয়ে আমরাই করবো'— অনন্ত আর নম্রতার চিৎকার।

'না। আমরা।'

'না। আমরা।'

'খবরদার।'

তখন নম্রতা মুখ খোলে বলে, 'বাবা, আই অ্যাম ক্যারিং। আর কোনো উপায় নেই বাবা।'

'উপায় আছে, দেয়ার আর মেনি নার্সিং হোমস্‌ ইন দি সিটি'— চৌধুরী দাঁতে দাঁত ঘষে।

তাহলে আমরা এখনই চললাম বিয়ে করতে, আমরা বিয়ে করে ফেললেই তোমাদের বিয়ে করা অসম্ভব হয়ে পড়বে— ছেলে মেয়ে বেরিয়ে পড়ে।

তোদের আগে আমরা পৌছবো কাজিবাড়ি— মিস্টার চৌধুরী আর হক দৌড়াতে শুরু করে।

তারপর অনন্ত আর নম্রতা এক গাড়িতে, আরেক গাড়িতে মিস্টার চৌধুরী আর মিসেস হক ধাবমান হয়। একটা চিরাচরিত গাড়ি রেসের দৃশ্য। কোন গাড়ি আগে পৌছাবে? এই গাড়িকে পাশ কাটিয়ে ওই লেভেল ক্রসিঙে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, এখানে কমলার ভ্যানগাড়ি উল্টে দিয়ে, সেখানে ভেড়ার পালকে আউলে দিয়ে দুই গাড়ি একই সঙ্গে কাজি অফিসে পৌঁছায়।

এই পর্যন্ত গল্পটা ঠিকই ছিল। এপর গল্পওয়ালার সঙ্গে নির্দেশকের মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। গল্পওয়ালার গল্পের শেষে ছিল—

কাজি বলবে, পাত্র-পাত্রীর গার্জিয়ানের পারমিশন লাগবে।

মিসেস হক ও মিস্টার চৌধুরী বলবে, আমরা এদের বৈধ গার্জিয়ান। আমরা ওদের বিয়েতে রাজি না।

আর আপনাদের গার্জিয়ান?

'আমাদের মা বাবা আগে মারা গেছে'— মিস্টার চৌধুরী ও মিসেস হক বলেন।

'ঠিক আছে। তাহলে আপনাদের বিয়েটাই পড়াবো।'

তখন নম্রতা ও অনন্ত কেঁদে ফেলে। তাদের কান্না দেখে মিস্টার চৌধুরীর হৃদয় বিগলিত হয়। বলেন, ঠিক আছে, আমার মেয়ের পেটে যখন একটা মানবসন্তান বড়ো হচ্ছে, সেই বেঁচে থাকুক। আমাদের বিয়ের দরকার নাই। মিসেস হক খুশিতে ডগমগ হয়ে বলেন, সত্যি! আমার বংশধর বেড়ে উঠছে আপনার মেয়ের পেটে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

তখন মা-বাবার সম্মতিক্রমে অনন্ত আর নম্রতার বিয়ে হয়।

ডিরেক্টর বলে, না না। কমেডি করা যাবে না। ট্রাজেডি করলে প্যাকেজ হিট হবে।

তখন ডিরেক্টরের ইচ্ছায় শেষটা হয় এরকম— মা-বাবার বিয়ে হচ্ছে দেখে অনন্ত একটা রিভলবার বের করে মাকে গুলি করে হত্যা করে।

পুলিশ এসে তার হাতে হাতকড়া পরায়। নম্রতা বলে, ওই হাতে আজ তুলে দেওয়ার কথা ছিল আমার হাত। কিন্তু সেখানে উঠলো হাতকড়া। ঠিক আছে আমি প্রতীক্ষায় থাকবো, যতোদিন পর্যন্ত না তুমি ফিরে আসো।

পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে অনন্তকে।

সেই গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে সাশ্রুনয়না নম্রতা— এই জায়গায় এসে প্যাকেজ শেষ হয়ে যায়।

৮

আকাশী প্যাকেজ ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, বাতাসে, শহরের আর শহরতলীর পথে পথে উচ্চারিত হতে থাকে— কার পাপে, কার পাপে। কার পাপের নির্দেশকের ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়— এ শহরের মানুষেরা হাস্যরসের চেয়ে করুণরসই পছন্দ করে বেশি, কার পাপের শেষ দৃশ্যে যখন পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে অনন্তকে, আর ক্যামেরা সেই গন্তব্যপথের দিকে স্থির থাকে, তারপর নম্রতার মুখের ক্লোজশট, নম্রতা বলে— কার পাপে এমন হলো, বাবা, কার পাপে, বাবা; তখন তার বাবা মিস্টার চৌধুরী কেঁদেকেটে বলেন— মা'রে, তুইও তোর বয়ফ্রেন্ডকে হারালি, আর আমি হারালাম গার্লফ্রেন্ডকে— তখন নম্রতা হাউমাউ করে ওঠে, বলে, যাক, তবু সান্ত্বনা, পেটে ওর সন্তান, এই সন্তানের জন্যেই আমি বেঁচে থাকবো, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে; আর মিস্টার চৌধুরী হাঁটু গেড়ে বসেন, বলেন, মা নম্রতা,

আমাকে ক্ষমা করে দিস মা, আর নম্রতা বলে, বাবা, আমাকে ক্ষমা করে দিও বাবা; তখন সমস্তটা শহর একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

গল্পওয়ালা সুপারহিট হয়ে যায়।

আকাশী প্যাকেজ আকাশে ছড়ানোর পরদিন যখন গল্পওয়ালা তার আগের গরম গরম গল্পগুলো নিয়ে শহরের রাস্তায় নামে, তার পিঠে যথারীতি ঝোলা, লম্বাটে চুলে অনির্বচনীয় বিষাদ, চোখের নিচে কালো ব্যাজ— সে শহরতলী ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীরা আর তরুণীরা তাকে ঘিরে ধরে; তার গল্প কেনার জন্যে সবার আগে দাঁড়িয়ে পড়ে শহরের সবচেয়ে বড়ো দুগ্ধ কোম্পানির ম্যানেজার। তার পরনে কোটপ্যান্ট, গলায় ঝুলছে লাল টাই, সে বলে, স্যার, স্যার, কাল রাতে বানানো গল্পগুলো আজ আমার কাছেই বিক্রি করুন স্যার। টাকার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি চেক লিখে দিচ্ছি, আপনি টাকার অঙ্কটা ইচ্ছামতো বসিয়ে নেবেন স্যার।

গল্পওয়ালা বিষণ্নভাবে এই লাল-টাইয়ের দিকে তাকায়। বলে, আপনি কে?

'আমি স্যার ম্যানেজার স্যার। দূর্বাঘাস দুগ্ধ কোম্পানির ম্যানেজার।' লোকটা তাড়াতাড়ি তার বিজনেস কার্ড বের করে দেয়।

'দূর্বাঘাস দুগ্ধকোম্পানি! আপনারা কি ঘাস বেচেন নাকি? শহরের লোকগুলো এখন ঘাস খেতে শুরু করেছে নাকি?'

'হা হা হা'— গল্পওয়ালার রসিকতায় ম্যানেজার সাড়া দেয়, তারপর বলে, 'কী যে বলেন স্যার। শহরবাসী ঘাস খাবে কেন? তারা গল্প খায়।' বলেই ম্যানেজার দাঁতে জিভ কাটে। তারপর বিষণ্নতার ভঙ্গিতে বলে, 'আমরা স্যার ঘরে ঘরে খাঁটি গোদুগ্ধ সরবরাহ করি।'

'ও। তাহলে আপনাদের কোম্পানির নাম কামধেনু রাখলেই পারতেন'— গল্পওয়ালা এবার নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে।

তখন ম্যানেজারটি এবং আশেপাশে সমবেত জনতা একযোগে হেসে ওঠে।

'স্যার, আপনার ঝোলাটি একটু খুলুন স্যার। গল্পগুলো দিয়ে দিন স্যার, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন।' ম্যানেজার দু'হাত জোড় করে চলন্ত গল্পওয়ালার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকা মানবজটলাটিও মন্ত্রের মতো বলতে থাকে— প্রসন্ন হোন প্রসন্ন হোন।

গল্পওয়ালা হেসে বলে, 'নগদ টাকা ছাড়া আমি গল্প বেচিনা।'

ম্যানেজার বলে, 'আমরা তো স্যার চেক দিচ্ছি।'

গল্পওয়ালা বলে, 'চেক দিয়ে আমি কী করবো?'

ম্যানেজার বলে, 'ব্যাংকে জমা দিবেন স্যার।'

গল্পওয়ালা বলে, 'ব্যাংকে আমার কোনো একাউন্ট নেই তো।'

লোকসকল ধন্য ধন্য করে ওঠে, বলে, দ্যাখো গল্পওয়ালাকে, কেমন সরল, কেমন সাদাসিধে।

'আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আমরা নগদ টাকাই দেবো।' ম্যানেজার তখন তার সহকারীকে আজ সকালে বেচা দুধের দাম একত্রিত করতে বলে।

গল্পওয়ালা বলে, 'কিন্তু আমার একটা নিয়ম আছে। এটা হলো আমার ব্যবসার নীতি। আমি একজনকে শুধু একটা গল্পই দিয়ে থাকি।'

ম্যানেজার বলে, 'ঠিক আছে স্যার। আজ শুধু একটা গল্পই দিন। আগামীকাল আবার আসবো স্যার।'

দুধ বিক্রি করে পাওয়া খুচরো টাকাগুলো একসঙ্গে করে দেখা যায়, মাত্র ১৬ হাজার ৭'শ ৯৯ টাকা হয়েছে।

সেই টাকা গ্রহণ করে গল্পওয়ালা দুগ্ধ কোম্পানিটিকে তাঁর একটা গল্প দিয়ে দেয়।

আর লোকসকল একযোগে ধন্য ধন্য করে ওঠে।

তখন, কিশোরীরা, যারা ইস্কুল যাচ্ছিল বলে তাদের পরনে রাজহাঁসের মতো শুভ্র বসন, যাদের মাথায় দু'বেণী, আর বেণীশীর্ষে শাদা ফিতা, তারা দু'সারি করে গল্পওয়ালার পথের দু'ধারে দাঁড়ায় খুবই সুশৃঙ্খলভাবে।

তারা হাত পাতে, আর বলে, স্যার, আপনার স্বাক্ষর। স্যার, আপনার স্বাক্ষর।

চারদিকের জনতা— তখন আকাশে মিষ্টি রোদ ছড়াচ্ছে সূর্য, আর আকাশ ছড়াচ্ছে মধুর কুয়াশা, হালকা বেগুনি, আর কতোগুলো চড়ুইপাখি ঝাঁপাঝাঁপি করছে ছাদে ও কুয়াশায়— একযোগে গেয়ে ওঠে, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন।

গল্পওয়ালা হাঁটতে থাকে, তাকে আরো বিষণ্ন ও বিধ্বস্ত দেখায়, সে তার পকেট থেকে একটা সিগনেচার কলম বের করে, আর সেটার খাপ খুলে এক হাতে শক্ত করে ধরে, তারপর হেঁটে যেতে থাকে। কলমটা ধরা থাকে তার ডান হাতে, ফলে পথের ডান দিকে যে কিশোরীরা হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতের তালুতে কলমের দাগ আঁকা হয়ে যায়, তারা খুশিতে হই হই রই রই করে ওঠে। আর পথের বাঁ পাশের কিশোরীদের মেলে ধরা হাত শূন্যই রয়ে গেছে, তারা কাঁদতে থাকে 'হায়' বলে। গল্পওয়ালা পিছে তাকায় না, সে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যেতে থাকে।

তারপর কোনো নতুন মহল্লায় গিয়ে হাঁক পাড়ে— চাই গল্প, গল্প নেবেন গল্প, নরম গল্প, গরম গল্প।

লোকজন দৌড়ে আসে, রান্নাবাড়া ছেড়ে আসে গৃহবধূরা, ফলে চুলোয় ভাত পুড়ে গন্ধ ছড়ায়, বাথরুমে ট্যাপ ছাড়া বলে বালতি উছলাতে থাকে। সবাই গল্প পায় না, কেউ কেউ পায়। যারা পায়, তারা যেন আশীর্বাদপুষ্ট। তাদের দিন আর রাতগুলো গল্পের ঘোরে উতলা হয়ে থাকে।

দূর্বাঘাস দুগ্ধ কোম্পানি সকাল সকাল কিনে ফেলা গল্পটি নিয়ে যায় তাদের ফ্যাক্টরিতে। একপাত্র গরম দুধের মধ্যে গুলিয়ে দেয় গল্পটা। তারপর সেই গল্প-গোলানো দুধ তারা মিশিয়ে দেয় ফ্যাক্টরির পুরো ট্যাংকভরা দুধের মধ্যে।

এরপর তাদের আর কিছুই করতে হয় না। পরদিন তাদের নিয়মিত ক্রেতারা দুধ নেয়। কেউ জ্বাল দিয়ে, কেউ বরফ মিশিয়ে দুগ্ধ পান করে। কেউবা আইসক্রিম বানায়, কেউ বা বানায় পায়েস-দধি। তারপর নিত্যদিনের উদাসীন ভঙ্গিতে সে সব তারা খায় দায় ছিটোয়। বাচ্চারা 'অ্যা-ছি দুধ খাবো না, বমি বমি লাগে' বলে যথারীতি দুধ বর্জন করতে চায়।

তারপরই ঘটে সেই অলৌকিক মজার ঘটনাটা, সবার মাথায় চারদিকে ঘুরতে শুরু করে গল্পের কথাগুলো, তাদের চরিত্ররা, সংলাপ আর সংঘাত— তারা চরিত্রগুলোর দঃখে কাতর হয়, আনন্দে হেসে ওঠে, ঘটনার সংঘাতে তারা হয় উত্তেজিত, রোমকূপ খাড়া হয়, অর্থাৎ কিনা একটা মিনি সাইজের গল্প শোনার সবটুকু আনন্দ আর সুফল আর পুষ্টি তাদের দেহমনে মিনি সাইজের অভিঘাত সৃষ্টি করে।

এই ভাবে গল্পওয়ালার গল্পগুলো পৌঁছে যায় সম্পন্ন মানুষদের ঘরে ঘরে। তাদের বাচ্চারা— যারা দুধ খেতে খেতে ক্লান্ত ও বিরক্ত— হঠাৎ এই স্টোরি ফ্লেভারের বেগুনি দুধ পান করে নেশায় যেন মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। গিভ মি এনাদার ওয়ান বলে তারা দুধের গ্লাস হাতে ধরে রাখে। তাদের নরম গোলাপি ঠোঁটে দুধের শাদাটে বেগনি দাগ সৃষ্টি করে এক মনোলোভা দৃশ্যের।

শহরের শিশুদের শৈশবগুলো হয়ে ওঠে আনন্দময় আর তাদের সামনে খুলে যায় কল্পনার একেকটা অনন্ত দরজা।

শহরের কিশোরদের কৈশোরক মুহূর্তগুলি হয়ে ওঠে বিশিষ্ট, তাদের চলন বলন কল্পনা হয়ে পড়ে আবেগপ্রবণ; প্রকৃতির দিকে তাকানোর জন্যে তাদের চোখের ভেতরে তৈরি হয় নতুন চোখ, তারা নারকেল পাতার থিরিথিরি কম্পন দেখে কেঁপে ওঠে, চাঁদের নিচে মেঘের দৌড় দেখে তাদের মন চলে যায় কোন পাহাড়ের শীর্ষে।

শহরের তরুণীরা হয়ে পড়ে তীব্র রোমান্টিক, তারা চাঁদের আলোয় শাদা সিগ্রেট জ্বালাতে যায়, চড়ুইয়ের বুকের উষ্ণতাটুকু অনুভব করে নিজেদের হৃদয়ে হৃদয়ে, আর পথের ধারে যে বাচ্চাটা শীতের রাতে একা একা ড্রেনের পানিতে পা ভেজাচ্ছে, তাদের জন্যে কাঁদে।

তরুণেরা সব যেতে চায় পাহাড়ে, তারা যাপন করতে চায় কাঠুরের জীবন; জ্যোৎস্না রাতে মহুয়ার মদ পান করে যদি যুগল নৃত্য করা যেতো বন্ধনহীন— তারা স্বপ্ন দেখে।

সঙ্গী বাছাইয়ের পুরোনো মূল্যবোধগুলো পাল্টে যায়, ক্রোড়পতির একটা দামী চেকের চেয়ে একগুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকার বিনিময়ে কোনো তরুণী হাসিমুখে দিতে পারে তার হৃদয়, একটা চমৎকার চুটকি বলার বিনিময়ে একজন তরুণ লাভ করতে পারে কোনো সৌখিন বনেদি মহিলার নিজ হাতে বুনে দেওয়া কার্ডিগান। আকাশে রংধনু উঠলে শহরের সব যুবক-যুবতীরা ছাদে গিয়ে নাচতে থাকে ময়ূরের মতো।

দুধের সঙ্গে গল্প মেশানোর বুদ্ধিটা সাফল্য লাভ করলে অন্যান্য ফ্যাক্টরির বৈজ্ঞানিকেরাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের প্রোডাক্টের সঙ্গে গল্পওয়ালার গল্প মেশানোর ফর্মুলা বানাতে। ভোজ্য তেলের কারখানাগুলো তাদের সয়াবিন, সর্ষে আর বনস্পতি তেলে মেশানোর জন্যে রোজ রোজ লাইন দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে কিনে নিয়ে আসে গল্পওয়ালার গল্প। তারা তেলের সঙ্গে গল্প মেশায়, কিন্তু তেলে গল্পে মিশ খায় না। কেক আর বিস্কুটের কারখানাগুলো আশা করেছিল, তারা অন্তত সফল হবে স্টোরি ফ্লেভারওয়ালা পণ্য বাজারে ছাড়তে, কিন্তু সেই বিস্কুটগুলো বাজারে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে আসতে থাকে শত সহস্র অযুত লাল পিপঁড়া। ভিক্ষা চাই না মা, পিপঁড়া তাড়া অবস্থা হয় তাদের।

সাবান ফ্যাক্টরিগুলো ভেবেছিল তারা ত সফল হবে গল্পওয়ালার গল্প মিশিয়ে সাবান উদ্ভাবন করতে। কারণ সোপ অপেরা চালিয়ে চালিয়ে তারা এইসব গল্প-কাহিনীর ব্যাপারে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু গল্প মিশিয়ে যে সাবান উৎপাদিত হয়, তা এতো শক্ত হয় যে, একফোঁটা ফেনাও হয় না সে সব সাবান থেকে। ইটের মতো শক্ত সেসব সাবান বিক্রি হয় না একটাও। ফলে, দুগ্ধ কোম্পানি ছাড়া অন্য সব কোম্পানি গল্পওয়ালার গল্প থেকে তেমন উপকৃত হতে পারে না।

তবে, শহরে একাধিক দুগ্ধ কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায়। তারা রোজ সকালবেলা বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে লোক রাখে। এই বুঝি এ রাস্তা দিয়ে গল্পওয়ালা যায়।

গল্পওয়ালার মর্জিও বোঝা ভারি দায়। কখন যে সে কোন পথ দিয়ে হাঁটে।

আর এই সব দুগ্ধ কোম্পানি গল্পের দাম দেয় অস্বাভাবিক বাড়িয়ে। ফলে, তার গল্প কেনাটা খুচরো ক্রেতার পক্ষে সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র ক্রেতারা তবু ভিড় করে বিভিন্ন রাস্তায়। যদি আজ এই পথ দিয়ে তিনি যান। কিন্তু এতো বড়ো শহর, আর শহরে এতো গলি ঘুপচি রাস্তা যে, কবে যে কোন্ পথ দিয়ে গল্পওয়ালা যাবে— কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। অনেকে হয়তো মাসের পর মাস দাঁড়িয়েছে রাস্তায়, আশায় আশায়, কিন্তু গল্পওয়ালাকে একনজর চোখের দেখাও দেখতে পায়নি।

৯

গল্পওয়ালা এখন থাকে শহরের মধ্যবর্তী স্থানে, একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে। বেশ বড়ো বড়ো ফ্লাট। তারা থাকে ছয়তলায়। লিফ্ট আছে। তবে মুশকিল হলো, প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে যায়, আর তখন লিফ্টটা যায় আটকে। এ সময় অ্যালার্ম বেল বাজাতে হয়। তখন, নিচতলা থেকে দারোয়ান সিঁড়ি বেয়ে ওঠে দশ তলায়, আর হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লিফ্টাকে যে কোনো একটা তলায় দাঁড় করায়। তারপর হাত দিয়ে টেনে তার দরজা খুলতে হয়। গল্পওয়ালা প্রথম যেদিন আটকে পড়ে লিফটে, সেদিন সে বাড়ি ফিরছিল ক্লান্ত পায়ে।

আজ সে অনেকটা পথ হেঁটেছে; দুধ কোম্পানির লোকদের ফাঁকি দিয়ে শহরের অলিগলি রাস্তায় কতোক্ষণ হাঁটা যায়, আর একা একা গলা ছেড়ে হাঁকা যায়— গল্প, গল্প নেবেন গল্প— এটা তার কাছে একটা খেলায় পরিণত হয়েছে।

সে যতো বেশিক্ষণ কোম্পানির লোকদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে, ততো খুশি হয়।

এইভাবে ঝোলা কাঁধে পথে পথে হাঁটতে তার বেশ ভালোই লাগে। ইঁদুর-বিড়াল খেলার ইঁদুরের মতো সে যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এ কথা ভেবেও সে অদ্ভুত আনন্দ বোধ করে।

কিন্তু আজ হয়েছে একটু অন্য রকম খেলা।

বিকালবেলা, একটা গলির মুখে, হঠাৎ করে একটা দুগ্ধ কোম্পানির প্রতিনিধি তার সামনে পড়ে যায়। তার গলায় টাই, গায়ে কোট, মাথায় হ্যাট— অথচ আজ গরম পড়েছে মন্দ না। এই লোকটাকে দেখেই গল্পওয়ালা নিশ্চিত হয় যে, এ হলো কালো গাই খাঁটি দুগ্ধ কোম্পানির লোক।

লোকটা বোধ হয় তাকে খেয়াল করেনি। গল্পওয়ালা কিন্তু তাকে ঠিকই খেয়াল করে। তার হ্যাটের নিচে মুখখানি অনেকখানি ঢাকা। তবু বোঝা যায়, তার বয়স বেশ কম। কম বয়সী লোকটা তাকে দেখেনি, গল্পওয়ালা এটা নিশ্চিত হয় তখন, যখন সে লোকটা তাকে সালাম না দিয়ে একটা উপগলির দিকে চলে যেতে থাকে।

গল্পওয়ালার মায়া হয়। আহা বেচারা। এখন যদি লোকটা তার দেখা পেতে ব্যর্থ হয়, তবে হয়তো তার চাকরিই চলে যাবে। কোম্পানি তাকে ধরবে, বিকাল ৪ টায় তোমার ডিউটি ছিল ১০২ নং গলিতে, ওই পথ দিয়ে ৪টায় হেঁটে গেছেন আমাদের গল্পওয়ালা, অথচ তুমি তার দেখা পেতে ব্যর্থ হয়েছো। এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। তুমি শুধু তোমার কর্তব্যকর্মে ফাঁকি দিয়েছো, তাই না, তুমি কোম্পানির অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতিও করেছো। এই অপরাধের শাস্তি তোমার ওপর

কার্যকর করলেও কম করা হয়, কেননা এই আর্থিক ক্ষতি ও সুনামের ক্ষতি আর কোনোদিন পুরণ করা যাবে না।

গল্পওয়ালা তখন গলা উঁচিয়ে লোকটাকে ডাকে— এই যে ভাই, শুনুন। গল্প নেবেন না, গল্প।

লোকটা হঠাৎ এদিকে তাকিয়ে খুব লজ্জিত হয়, তার মুখে ধরা পড়ে যাওয়ার একটা ভঙ্গি ওঠে ফুটে।

'আসেন আসেন, এদিকে আসেন, আপনাদের যন্ত্রণায় একটু একা একা হাঁটাও যাবে না দেখছি'— গল্পওয়ালা বলে।

লোকটা এগিয়ে আসে, সালাম দেয়। তারপর বলে, ভুল হয়ে গেছে স্যার। আমি এ কোম্পানিতে নতুন এসেছি।

'না না। ভুল কী?' গল্পওয়ালা তার পিঠ চাপড়ে দেয়।

'এই যে স্যার আপনার সামনে পড়ে গেলাম। এটা স্যার আমার দোষ। কোম্পানির দোষ না। কোম্পানি থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, গল্পওয়ালা স্যার কোম্পানির লোকদের ফাঁকি দিতে ভালোবাসেন, কাজেই তাকে ফাঁকি দিতে দাও, খুব তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলো না, গোপনে তাকে অনুসরণ করো, পরে একদম শেষ সময় তাকে ধরে ফেলার ভান করো। কিন্তু আমি স্যার ধরা পড়ে গেছি। দোহাই স্যার, আপনি আমার কোম্পানিকে এটা জানিয়ে দেবেন না।'

গল্পওয়ালা আকাশ থেকে পড়ে। এই অবস্থা নাকি। কিন্তু সে রেগেও যায় না, দুঃখও পায় না। বরং মজা পায়। লোকগুলো তার মতো একটা নিরীহ গোবেচারা টাইপ মানুষকে খুশি করতে কী না করছে! মজার ব্যাপার তো!

'না। আপনি ঠিকই করেছেন'— গল্পওয়ালা বলে, 'আমি আসলে আজ হাঁটতে চাইছিলাম না, খুব ক্লান্ত লাগছিল এই সময়টায় হাঁটতে; আপনাকে পেয়ে বরং আমার বেশ লাগছে।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

'আপনার কোম্পানি যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে যায়, তাহলে তারা ভুল করবে। তাদের বলে দেবেন।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমি যদিও এ ধরনের কথা বলার সাহস রাখি না।'

'ঠিক আছে। আপনার বলার দরকার নাই। আমি বলে দেবো।'

'ধন্যবাদ স্যার'— লোকটা গভীর কৃতজ্ঞতাভরা চোখ নিয়ে গল্পওয়ালার দিকে তাকায়।

'আসলে ব্যাপার কী জানেন, মানুষের মন জিনিসটা বড়োই বিচিত্র। আমি

যখন ফেরি করতে রাস্তায় বেরোই তখন ছেলেপুলেরা আমাকে ঘিরে ধরে রাখে, আর আমার একটু বিরক্তই লাগে। এই যে পথ, এই ফুটপাত, এই যে কোথাও কোথাও আছে ছায়াবৃক্ষ, এই আবাসিক এলাকাটা বেশ নির্জন— এই পথ দিয়ে কি আমি একা একা একটু হাঁটতে পারবো না। একটু সুর করে ডাকতে পারবো না— গল্প নেবেন গল্প। আবার— এই রাস্তাটায় যেমনটা ঘটলো— আমি একা একা হাঁটছি, দু একবার বেশ দরদ দিকে হাঁকও দিলাম, কিন্তু কেউ আমার পথের দু'ধারে ভিড় করছে না, কেউ স্বাক্ষর চাইছে না— আমার মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেলো। নির্জনতা ব্যাপারটা কিন্তু আমি খুব উপভোগ করি, এতো দিন অন্তত তাই জানতাম, অথচ আজ এই নির্জনতা আমার ভালো লাগছিল না। এই সময় হঠাৎ আপনি এসে গেলেন। আচ্ছা ব্যাপার কী বলুন তো। এই মহল্লার লোকজন কি আমার কথা শোনেনি, নাকি গল্পটল্প বিষয়ে এদের কোনো উৎসাহ নেই?'

'আসলে, ব্যাপার তা নয়। এই এলাকাটা একটা বিশেষ এলাকা বটে। এরা সবাই পড়ে বিদেশি মিডিয়ামে। মাতৃভাষাটা এরা বোঝে না। দেশী বই এরা পড়ে না। ফলে আপনার ব্যাপারে এদের কোনো আগ্রহ নেই। তবে আপনার কোনো গল্প যদি আপনি বিভাষায় বানিয়ে ফেলেন, তাহলে এরা আপনার কদর করতে পারবে।'

'হুম্। এটা তো কখনো ভেবে দেখিনি।'

'তার ওপর আরেকটা ঘটনা ঘটছে। এখন বোকা-বাক্সে দেখানো হচ্ছে ক্রিকেট খেলা। সেটা এক দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। শহরের প্রতিটা ছেলেবুড়ো এখন এই খেলা দেখছে।'

'আর মেয়েরা কী করছে?'

'মেয়েরাও দেখছে। তবে একভাগ মেয়ে দেখছে খেলা, একভাগ মেয়ে দেখছে খেলোয়াড়, আর একভাগ মেয়ে বোকা-বাকসোর সামনে বসে আছে খ্যাত্ হয়ে যাবার ভয়ে।'

'তাই হবে। নইলে অন্তত মেয়েরা আমার ডাক শুনে উঁকি-ঝুঁকি মারতো। মেয়েরা বলে, আমার গলার স্বরে নাকি কী জাদু আছে, তা তাদের কানে ধরে পথে নিয়ে আসে, হা-হা-হা।'

কোম্পানির প্রতিনিধিটা স্যারের সঙ্গে তারও হাসা উচিত কিনা বুঝতে পারে না। তবে একটা হাসি হাসি ভাব মুখে নিয়ে আসে।

'আচ্ছা, আপনি এখন পথে পথে হাঁটছেন কেন? আপনার কি খেলা দেখতে ইচ্ছা করছে না?' গল্পওয়ালা জিজ্ঞেস করে এই যুবকটিকে।

'আমার তো এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি বহুকষ্টে এই চাকরিটা পেয়েছি। প্রথম ছয়মাস আমি মাসে এক হাজার টাকা করে ফি দিয়ে এদের কাজ

শিখেছি। পরের ছয় মাস, আমাকেও টাকা দিতে হয় নি, ওরাও বেতন দেয়ান। এই মাস থেকে ওরাই আমাকে এক হাজার টাকা করে মাসোহারা দেবে।'

'এক বছরের ট্রেনিঙে আপনি কী শিখছেন?'

'পারচেজিং।'

'কী পারচেজিং'

'আপনার গল্প।'

'বলেন কী! আপনাদের কোর্সে কী কী আছে।'

'গল্পওয়ালার মনস্তত্ব গবেষণা আর পর্যালোচনা। গল্পওয়ালার কাছ থেকে সর্বোত্তম গল্পটা ক্রয় করিবার উপায়। এ রকম আরো অনেক কিছু। সব ঠিক মনে নেই স্যার। ভুলে গেছি। স্যার, আপনাকে এসব বলে দিচ্ছি, আমার কোনো অসুবিধা হবে না তো স্যার।'

'না না। কে আপনার অসুবিধা করবে? আমি আছি না। আপনার নামটাই তো জানা হলো না? কী যেন নাম।'

'জনাবুল ইসলাম।'

'বাহ। দারুন নাম। নিজের নামের আগে জনাবটা স্থায়ীভাবে লাগিয়ে নিয়েছেন।'

জনাবুল ইসলাম দাঁত বের করে হাসে।

'তো জনাবুল ইসলাম, পড়াশোনা শেষ। ট্রেনিং শেষ। চাকরি-বাকরি করছেন। আপনি তো সৌভাগ্যবান। কী বলেন।'

'আপনাদের দোয়া স্যার।'

'বিয়ে করেছেন।'

জনাবুল ইসলাম লাজুক ভঙ্গিতে বলে, 'জি না স্যার।'

'প্রেম করছেন?'

লাজুকতা আরো বৃদ্ধি পায় জনাবুল ইসলামের চোখে মুখে, 'জি স্যার।'

'তাই নাকি? তো মেয়েটি কী করে।'

'স্যার। সবই আপনার দোয়া স্যার। আপনার দয়া স্যার। আমি আপনার গল্প কিনি, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, পাড়ার মেয়েগুলো স্যার কী করে যেন সেই কথাটা জেনে গেছে। পাড়ায় আমার খুব কদর স্যার।'

'তাই নাকি?'

'এক সঙ্গে পাঁচটা প্রেম করছি। তবে বিয়ে করবো ফাল্গুনিকে। আমার কাজিন।'

'ফাল্গুনি কোথায় থাকে?'

'দেশগ্রামে।'
'তা শহরের মেয়েরা খারাপ কী! দেখতে শুনতে ভালো নয়?'
'তা নয় স্যার। যদি অভয় দেন, তা হলে বলি।'
'আচ্ছা বলুন। নির্ভয়ে বলুন।'
'শহরের মেয়েরা স্যার আপনার গল্পের ভক্ত। মানে আপনার ভক্ত। আপনাকে না পেয়ে তারা আমার প্রেমে পড়েছে। আমিও তাদের কাছে যাই। কথাবার্তা বলি। ভালোই লাগে।'
'চুমুটুমু খান না?'
লজ্জা পেয়ে জনাবুল এ প্রশ্নের জবাব দেয় না।
'হ্যাঁ। বলুন। তারপর।' গল্পওয়ালা এগিয়ে দেয় গল্পটুকুন।
'কিন্তু ফাল্গুনি স্যার আমাকে ভালোবাসে অনেক আগে থেকে। আমার চাকরি হওয়ারও আগে থেকে।'
'বুঝতে পেরেছি জনাবুল। আমি সম্ভবত আপনার কথা বুঝতে পেরেছি।'
'স্যার আমার কথায় কি মনে কিছু করলেন?'
'আরে না। মনে করার কথা আসছে কোথেকে?'
'তবে স্যার ফাল্গুনিও আপনার গল্পের খুবই ভক্ত। দেশগ্রামে আগে তো স্যার আপনার গল্প পাওয়া যেতো না। এখন এই দুধের কোম্পানিগুলো আপনার গল্প সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন মাঝেমধ্যে পাওয়া যায়। আমিই তো নিয়ে গিয়েছিলাম তিন প্যাকেট দুধ। ফাল্গুনি মুখে দিয়েই আপনার গল্পের জাদুতে পড়ে গেলো।'
'ঠিক আছে জনাবুল। ফাল্গুনি না হয়ে আপনারই জাদুতে বাঁধা থাকুক। অসুবিধা কী? হা হা হা।'
জনাবুলের সঙ্গে গল্প করতে করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। একটা ট্যাক্সিতে করে গল্পওয়ালা ফিরে আসে তার বাড়ির দিকে। অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় হাঁটার কারণে গল্পওয়ালার ভীষণ পেশাব পেয়েছে। আর একটু হলেই সে বুঝি কাপড়-চোপড় নষ্ট করে ফেলবে। সে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া দিয়েই এক দৌড়ে গিয়ে লিফ্‌টে চড়ে। ৬ তলার বোতাম টেপে। লিফ্‌ট ফাঁকাই ছিল। একটু ঝাঁকি খেয়ে তা ওপরে উঠতে শুরু করে। মাঝপথে এসে হঠাৎই বিদ্যুৎ চলে যায়।
এই সেরেছে রে! গল্পওয়ালা প্রমাদ গোনে। এখন টেপো অ্যালার্ম। দারোয়ান ব্যাটা গেটে আছে কি নেই কে জানে! এখন, এই মুহূর্তে, তার পেট যে পেশাবের চাপে ফেটে যায়নি, এটাই আশ্চর্য। তারওপর এখন দাঁড়িয়ে থাকো অনিশ্চয়তা নিয়ে।
কেমন লাগে! উ হু হু। উ হু হু।

১০

সে দিন লিফ্‌টে আটকা পড়ার পর থেকে গল্পওয়ালার মনে লিফ্‌ট-ভীতি স্থায়ী হয়ে যায়। এরপর থেকে গল্পওয়ালা আর কোনোদিন লিফ্‌টে চড়ে না।
তার স্ত্রী রেবা এই নিয়ে হাসাহাসি করে। বলে, 'গল্পওয়ালা, লিফ্‌টে না চড়লে তুমি উপরে উঠবা কী করে। তোমার না খুব উপরে ওঠার শখ।'
শুনে গল্পওয়ালা খুব দুঃখ পায়। বলে, 'আমার সম্পর্কে তোমার এই ধারণা রেবা! আমি উপরে উঠতে চাই!' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
রেবা গল্পওয়ালার এই দীর্ঘশ্বাসের কারণ ঠিক ধরতে পারে না।
রাত দশটার দিকে বিদ্যুৎ চলে যায়। সাধন বলে, শিট, আমার হোমওয়ার্কটাই তো শেষ হলো না।
রেবা বলে, বাইরে কী রকম চাঁদের আলো দেখেছো। সাধনের বাবা, চলো ছাদে যাই।
গল্পওয়ালা খুশি হয়। যাক, রেবা নিজ থেকে একটা কিছু করতে চেয়েছে। একটা অন্য রকম কিছু।
তারা ছাদে যায়। বারোয়ারি ছাদ। তবু ছাদে একটা লোকও নেই। এই বিল্ডিঙের লোকগুলোর কি চোখ নেই, নাকি মন নেই!
একটা মাদুর বিছানো হয়।
আজকের চাঁদটা হাতে বেলা রুটির অর্ধেকটার মতো। গল্পওয়ালার মনে হয় এ কথা কেন মনে হলো। সে যে খুব ক্ষুধার্ত— তাতো নয়। তবে জীবনের বেশির ভাগটা সময় তাকে খাবারের চিন্তা করতে হয়েছে। বিয়ের পরও তাদের এমন দিন গেছে, চুলোয় হাঁড়ি ওঠেনি। আজ অবশ্য তাদের সে রকম অবস্থা নয়। দিন পাল্টে গেছে। কিন্তু অবচেতন মন থেকে ক্ষুধার দাগটা মুছে যায়নি।
সাধন ছাদময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে।
রেবা বলছে, এই সাধন। বেশি দুষ্টুমি করো না। ছাদে কিন্তু ভূত থাকে।
সাধন ভয় পেয়ে কাছে চলে আসে। রেবা বলে, বাবা, চাঁদটার দিকে দেখে রাইমস বলো তো। সঙ্গে সঙ্গে সাধন শুরু করে দেয়:

ওহ লুক এট দি মুন
শি ইজ শাইনিং সো হাই
ওহ মাদার শি লুকস
লাইক আ ডায়মন্ড ইন দি স্কাই।

আকাশে পাতলা পাতলা মেঘও স্থির হয়ে আছে। চাঁদের আলো পড়ে সেগুলো বিভিন্ন আকার নিয়েছে। সাধন সে সবের দিকে তাকিয়ে বলে, মা, দ্যাখো, ওই মেঘটা, ঠিক যেন একটা রাজহাঁসের মতো।

'কই।'

'ওই যে।' সাধন মায়ের আঙুল তুলে রাজহাঁস দেখায়।

'মাথাটা কোন দিকে। তোর রাজহাঁসের মাথাটা কোনদিকে?'

'ওই তো মাথা। ওই যে ঠোঁট। দেখেছো?'

রেবা বোধহয় ধরতে পারেনি, তবু সে বলে— 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

চাঁদের দিকে তাকিয়ে গল্পওয়ালা বিস্মিত হয়। এই একটা চাঁদ, শৈশব থেকেই এটাকে সে দেখে আসছে, তবু এটা পুরোনো হয় না কেন? তার শৈশবেও তার মা এমনি করে তাকে কোলে নিয়ে উঠোনে বসে থাকতো। জাতিস্মরের মতো যেন সে মনে করতে পারে পূর্বজন্মের কথা। মায়ের কোলে বসে সে হাত ছোড়ে, হাত-পা নাড়ে। মা বলে, দুষ্টুমি করো না। ওই দ্যাখো, চাঁদের বুড়ি চড়কা কাটছে। আর সে, ক্ষুদে গল্পওয়ালা, চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকেও কোনো বুড়ির অবয়ব ঠাওর করতে পারে না।

গল্পওয়ালা আজ ফের তাকায় চাঁদের দিকে। নাহ এই অর্ধেক চাঁদেও সে কোনো বুড়ি-টুড়ি খুঁজে পায় না।

রেবা সাধনকে কোলে নিয়ে ছড়া শোনায়—

আয় চাঁদ লইড়া চইড়া
ভাত দিমু বাইড়া
কলাগাছ চইড়া
কলা দিমু পাইড়া
মাছ কুটলে মুড়া দিমু
চাল কুটলে কুড়া দিমু
কালো গাইয়ের দুধ দিমু
দুধ খাওয়ার বাটি দিমু
বুড়ারে টুকলুস দিয়া যা—

এই ছড়াটা গল্পওয়ালা কখনো শোনেনি। এটাই তো আসল মনে হয়। সাধন ঘুমিয়ে পড়েছে। রেবা তাকে মাদুরে শুইয়ে দেয়, মাথাটা রাখে তার

কোছার ওপর।

তারপর দুজনে চুপচাপ বসে থাকে।

চাঁদের আলো তাদের মাথায় স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ পর মুখ খোলে গল্পওয়ালা। বলে, 'সংসারের ধকলে ধকলে তোমার অবস্থা যাতা হয়ে যাচ্ছে। একটু বিশ্রাম দরকার। চলো, কোথাও বেড়াতে যাই।'

'আমার দিকে তোমার নজর আছে নাকি। সংসারে আমি যে একজন মানুষ পড়ে আছি, তুমি কখনো চোখ তুলে চেয়ে দেখেছো।'

'সে অভিযোগ অবশ্য তুমি করতেই পারো। আমি তো খুব আত্মমগ্ন মানুষ। নিজেকে নিয়েই আছি।'

'তোমার মতো মানুষের বিয়ে করাই উচিত হয়নি। বিয়ে করেছিলে কেন?' রেবা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে!

'তাই হবে হয় তো। তোমার প্রতি খুব বড়ো অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। তবে তোমার ক্ষতি হয়, এমন কোনো কিছুও আমি করিনি।'

'না। সে কথা হচ্ছে না। সেদিক থেকে তুমি তো ভালো। বেশ ভালো। তবে সংসারে কী হয়, না হয়, তুমি কোনো কিছুই খেয়াল করো না। তোমাকে চিকা ভেজে এনে পাতে দিলেও তুমি কোনো দিকে না তাকিয়ে খেয়ে উঠে যাবে। এই সংসারটা কী ভাবে চলছে, তোমার ছেলেটা কোথায় পড়ে— তুমি জানো?'

তা অবশ্য ঠিক। গল্পওয়ালা এসবের কিছুই জানে না। সে বলে, তা হলে চলো, আমরা বেড়াতে যাই। পাহাড় দেখতে যাবে, নাকি সমুদ্র?'

'না। বেড়াতে-টেড়াতে কোথায় যাবো? একবারে জানটা বেরিয়ে গেলে বাঁচি। পরপারে বেড়ানো হবে।'

কিন্তু রেবার জান বেরিয়ে যাওয়ার আগেই তারা বেড়াতে যায়। টাকা পয়সার চিন্তা ছিল না বলে, তারা উড়াল দিলো বিমানে; সমুদ্রতীরের বিমানবন্দরে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিতো এলো একটা জিপ— যেটা দূর্বাঘাস দুগ্ধ কোম্পানি আগে থেকেই তাদের জন্যে ভাড়া করে রেখেছিল। সেই জিপে মাইলখানেক পথ অতিক্রম করার পর তারা ওঠে একটা পাঁচতারা মোটেলে; দুটো ডাবল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষও রিজার্ভ করা ছিল তাদের জন্যে। সাধনকে দেখার জন্যে তারা একজন তরুণী পরিচারিকাকেও সঙ্গে এনেছে।

তারপর তারা ঘুরে বেড়ায়। মুক্ত স্বাধীন। এখানে আর রাত জেগে জেগে গল্প বানাতে হবে না— ভাবতেই নিজেকে বড়ো নির্ভার লাগে গল্পওয়ালার।

আসার আগে সেই জন্যে বেশ কিছুদিন তাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। দুধ ফ্যাক্টরীর জন্যে সাত দিনের সাতটা নতুন গল্প সে অতিরিক্ত বানিয়ে দিয়ে এসেছে। এখন সাত সাতটা দিন সে মুক্ত। তারা সমুদ্রে গোসল করে, বালুকাবেলায় মধ্যরাত অবধি বসে থাকে, হোটেলের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে, দামি রেস্তরাঁয় দুপুরের খাবার রাতের খাবার খায়, আর এখানে ওখানে যা খুশি তাই কেনাকাটা করে। এ সমুদ্রতটে কেউ গল্পওয়ালাকে চেনে না, একজন দুজন যারা শহর থেকে এসেছে তারা ছাড়া, ফলে নিরুপদ্রব স্বাধীনতায় বন্ধনহীন প্রহর কাটতে থাকে— যেন জলের ওপর ভেসে থাকা চিৎ হয়ে।

রাতের বেলা গল্পওয়ালার 'কী করি, এখন কী করি' অবস্থা হয়। কেননা সে বহুদিন হলো প্রতিটা রাত কাটিয়ে দেয় গল্প বানিয়ে।

আর সারাটা দিন একই অবস্থা হয় রেবার। রান্নার কাজ করতে হচ্ছে না, ঘরদোর সাফ সুতরো করার বালাই নেই— কতোক্ষণ আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়।

দিনের বেলা সমুদ্র-সৈকতে হাঁটাহাঁটি করে রেবা সেদিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রাতে হোটেল কক্ষের সুপরিসর বিছানায় গা লাগাতেই চোখে ঘুম এসে যায়। কিন্তু গল্পওয়ালার চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না।

একা একা ঘরের মধ্যে সে কী করবে। কাজ তো নেই। গল্প বানানোর ঝামেলা নেই।

সে রেবাকে ডাকে। রেবা ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরে শোয়। সে আবার ডাকে। রেবা ওঠে। 'কী ব্যাপার?'

'ওঠো। ব্যাপার আছে। যাও মুখ ধোও।'

রেবা চোখেমুখে পানি দিয়ে আসে। গল্পওয়ালা বলে, চলো, বাইরে যাই। সমুদ্রপারে গিয়ে বসে থাকি।

'পাগল হয়েছো নাকি? এতো রাতে কোথায় যাবে?'

'না চলো।'

তখন রাত হবে একটা কি দুটো। তারা দুজন, আস্তে করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। হোটেলের সামনের লাউঞ্জে, তখন দারোয়ানও ঘুমিয়ে। 'জরুরি দরকার' বলে একজন ঘুমন্ত দারোয়ানকে ডেকে গেট খুলে নিতে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে তারা পৌঁছে যায় সমুদ্রতীরে। রাতের সমুদ্র। জলে গর্জন ভেসে যায় বহু দূরে। বড়ো ঢেউ, মাথায় ফসফরাসের শাদা ফেনা, ঝাউগাছে বাতাসের ঝাপটা, আকাশ ভরা অনন্ত নক্ষত্রবীথি, আর সোঁ সোঁ বাতাস— নির্জন

সমুদ্রতীরে তারা বসে পড়ে। ওদিকে দুটো ঝিনুকের দোকানে এখনো বাতি জ্বলছে। একটা দুটো মানুষের জেগে থাকার লক্ষণও ভেসে আসে ভেজা বাতাসে।

'এখানে বসবে?' রেবা বলে।

'না, চলো, আরো দূরে যাই; এই দোকানের আলো থেকে দূরে, ওই পাহারাওয়ালার বাঁশি থেকে দূরে।' তারা হাঁটে, তাদের খালি পায়ের নিচে ভেজা বালি। সমুদ্রতরঙ্গ একেকবার এসে তাদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রকে সমান্তরাল করে তারা হাঁটে। দূরে দূরে জেলেদের সঞ্চালন দেখতে পাওয়া যায়। একেবারে মানুষের শরীর থেকে ছড়ানো বাতাসের বাইরে বুঝি তারা যেতেই পারবে না। আকাশে চাঁদ নেই, আছে শুধু অসংখ্য নক্ষত্র। এমন ছোটোবড়ো গুঁড়ো গুঁড়ো নক্ষত্রে ভরা আকাশ তারা কি এর আগে কোনো দিন দেখেছে!

কতোক্ষণ তারা হেঁটেছে, তাদের খেয়াল নেই। বালিভরা সমুদ্রতীরের এই জায়গাটা ঝাউগাছ আর বড়ো বড়ো ঘাসে ভরা।

'আসো, এখানটায় বসি'— গল্পওয়ালা বলে।

তারপর তারা দুজন চুপচাপ বসে থাকে। গল্পওয়ালার কাঁধে মাথা রেখে শরীরের ভার এলিয়ে দিয়ে বসে থাকে রেবা অনেকক্ষণ। খানিকপরে ভোর হবে নাকি! সমুদ্রের ভেজা বাতাস আর এই গর্জন কি নিয়ে আসবে ভোরের আলো।

'আজ আমরা এখানে বসে থেকে সূর্যোদয় দেখবো'— গল্পওয়ালা বলে।

'আচ্ছা'— আহ্লাদী গলায় রেবা বলে।

'ভোর হতে মনে হয় এখনো দেরি আছে'— গল্পওয়ালা নক্ষত্র দেখে সময় বোঝার চেষ্টা করে।

'এখন কী করি'— রেবা বলে।

'এসো এই বালিতে, এই ঝাউগাছের আড়ালে, এই অন্ধকারে শুয়ে পড়ি।'

'আসো।'

তারা শুয়ে থাকে। গল্পওয়ালা রেবার আঁচল সরিয়ে দিতে যায়।

'এই কী করো?'

'এসো শুই। খোলা আকাশের নিচে। এই বুনো ঘাসের আড়ালে।

'যা পাগল।'

'কেন?'

'সে তো ঘরে গিয়েই শোওয়া যাবে।'

'তা যাবে। কিন্তু এখানে শোওয়াটা হবে অন্যরকম। দুজনে একদম সুতোটি গায়ে না জড়িয়ে শুয়ে থাকবো। আদিম মানব মানবীর মতো।'

'যাও।'

'না করো না প্লিজ।'

'না না।'

গল্পওয়ালা আর জোরাজুরি করে না। চুপচাপ শুয়ে থাকে।

১১

গল্পওয়ালার কাছে রোজ চিঠি আসে। চিঠি এসে তার ঘর বোঝাই হয়ে যায়। ডাকপিয়ন গজরগজর করে। বলে, শহরের সব চিঠি দেখি এই ঠিকানাতেই আসে। তাহলে শহরের সব পিয়নের বেতন কেটে কেন তাকেই দিয়ে দেওয়া হয় না।

প্রথম প্রথম এসব চিঠি খুব মন দিয়ে পড়তো গল্পওয়ালা। ইদানীং তেমন মন দিয়ে পড়তে পারে না। তবে সে পড়তে চায়। পড়লে উপকার হয়। তার গল্পভোক্তাদের ভালো লাগাটুকু তাকে প্রেরণা যোগায়, তাদের খারাপ লাগাটুকু থেকে সে শিক্ষা নিতে চায়। তবে শুধু এই সব নয়। গল্পের নানা উপাদান, মশলা, সুঘ্রাণ, ঝাল-মিষ্টি— কখনো কখনো কর্নফ্লাওয়ার বা কাহিনী এসে যায় এসব খামের ভেতর। এসব উপাদান উপকরণ ব্যবহার করে সে দেখেছে, গল্পে নতুন গন্ধ আসে, নতুন স্বাদ যুক্ত হয়। সাধারণ ভোক্তারা এসব গল্প দারুণ পরিতৃপ্তি সহকারে সেবন করে। তারিফ করে।

তবে অন্য রকম চিঠি যে আসতো না, তাও না। কিশোরী আর তরুণীরা, যাদের কাছে এই নীলিমা এই মেঘ, এই পাতায় পাতায় আলোর নাচন প্রতিদিন ঝনঝমকে আয়নার মতো তুলে ধরে নিজেরই উজ্জ্বল মুখ, যারা ভেবে ভেবে ব্যথা পায়— যে বেদনা তার নয় তেমন বেদনাও, যারা আকাশে চিলের বিষণ্ন উড়াল দেখে মরমে মরে যায়, কেঁপে ওঠে, যাদের বুক ভরা অকারণ পুলক, অকারণ বেদনা— যারা এসবের কোনো কিছুর মানে বোঝে না, তাই সব কথার আগে পরে— কী জানি কেন রে আজি— অকারণে বারে বারে— কে জানে কাহার তরে— এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করে; তারা সহজেই প্রেমে পড়ে যায় গল্পওয়ালার। অন্য কোথাও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ফল্গুধারা বইয়ে দেওয়ার সুযোগ না পেয়ে গোপন চিঠিতে তারা অসংকোচে ব্যক্ত করে তাদের ভালোবাসা।

গল্পওয়ালা জানে— এই ভালোবাসা ব্যক্তি গল্পওয়ালার জন্যে নয়, এই ভালোবাসা হলো ভালোবাসাকে ভালোবাসা।

প্রথম যেদিন এমন একটা চিঠি পেয়েছিল গল্পওয়ালা, সত্যের খাতিরে বলে রাখা দরকার যে, গল্পওয়ালার মনের বন্ধ দরজায় বেজে উঠেছিল করাঘাত,

জানলাগুলো কবাট খুলে দিয়েছিল।

চিঠিতে কী লেখা ছিল, আজ আর ঠিকমতো মনে পড়ে না, তবে খুব আবেগ বিহ্বল ভাষায় এক তরুণী বলেছিল, আমার বয়স ১৬, তাই বলে আমাকে ছোট্ট ভাববেন না, কারণ দেখতে শুনতে আমাকে বেশ বড়োসড়োই দেখায়, আর প্রচুর পড়াশোনা করেছি বলে দুনিয়ার প্যাঁচ ঘোঁচ আমি অনেকই বুঝি।

আমি আপনার অনেকগুলো গল্প সেবন করেছি, প্রতিটা গল্প বার বার করে সেবন করেও আমার স্বাদ মেটে না, এখন আমি সকাল-সন্ধ্যা কেবল আপনারই ধ্যান-জ্ঞান করি। ভাববেন না— এ নিছক গল্পের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। গল্পের নয়, এখন আমি ভালোবাসি আপনাকে। আর সত্য কথা বলতে কী, যে আপনার একটা গল্প সেবন করেছে, তার পক্ষে আপনাকে না ভালোবেসে একটা দিনও কাটানো অসম্ভব, আর যে আপনাকে স্বচক্ষে দেখেছে— তার পক্ষে আপনার প্রেমে দিওয়ানা না হয়ে পড়াটাই পাগলামির লক্ষণ।

আমি আপনার অনেক গল্প আস্বাদন করেছি, আর আপনাকে দেখার জন্যে পথ থেকে পথে ঘুরে বেড়াই।

এখন, আমার প্রতিটা রক্তকণায় একটাই সুর বাজে— গল্পওয়ালা।

এখন, আমার প্রতিটা রোমকূপে একটাই আর্তি— গল্পওয়ালা।

গল্পওয়ালা, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে পেতে চাই, একান্ত করে পেতে চাই, স্পর্শে ও আলিঙ্গনে পেতে চাই, গল্প-আলাপে-সংলাপে পেতে চাই, জীবনের সঙ্গে জীবনকে ছেনে মেখে বিলীন করে দিয়ে পেতে চাই।

তুমি কি একটু করুণাও করতে পারো না!

একটি ছত্র লিখে কি তুমি ধন্য করে দিতে পারো না আমার এই মানুষ হয়ে জন্মানো।

হায়, আমি যদি একটা ছোট্ট চড়ুই হয়ে জন্মাতাম, আমি তোমার বারান্দায় গবাক্ষে বাসা বানাতে পারতাম— তাতেও তো ধন্য হয়ে যেতে পারতো আমার জীবন।

জানি, তুমি আমাকে গ্রহণ করবে না, পাত্তা দেবে না...।

ঠিক আছে। ভালোবেসে আমি দিতে জানি, নিতে জানি না। তুমি আমাকে ভালোবাসো, কি না বাসো, আমি তোমাকে চিরটাকাল দুর থেকে ভালোবেসে যাবো...।

এ ধরনের চিঠি আর তার লেখিকাকে— প্রথম দিকে, যখন এ ধরনের স্তাবকতা পাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়নি, সে ছিল বড়ো নিষ্পাপতার কাল— ভুলে

যাওয়া আর মাথার বাইরে রাখা অসম্ভব ছিল গল্পওয়ালার পক্ষে।

ফলে, এই পত্রলেখিকার চিঠির জবাব দিয়েছিল গল্পওয়ালা। কিন্তু তার জীবনে যে এক ভীষণ সর্বগ্রাসী ভক্ত হয়ে দেখা দিলো, সে কিন্তু এই পত্রলেখিকা নয়— পত্রলেখিকার স্কুল-বন্ধু। তার নাম সুস্মিতা।

সুস্মিতার ক্লাসে তাদের এক বন্ধু গল্পওয়ালার চিঠি নিয়ে আসে— তাতে গল্পওয়ালা তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে চিঠি লেখার জন্যে, আর তার অনুরাগে গল্পওয়ালা যে অনুপ্রাণিত, তাও জানিয়ে দিয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু গল্পওয়ালা তাকে লেখেনি। এই চিঠি আর চিঠির নিচে গল্পওয়ালার স্বাক্ষর দেখে পুরো শ্রেণীকক্ষের মূর্ছা যাবার জোগাড়, পরে সব মেয়ে একযোগে ঈর্ষায় দগ্ধ হতে থাকে এই পত্র-প্রাপিকার সাফল্যে।

তখন সুস্মিতা, যে ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী বলে পরিগণিত, নিজেকে বিদ্রূপায়িত বলে ভাবতে থাকে, তার শ্রেণীকক্ষে সর্বসমক্ষে সে ঘোষণা করে, এই গল্পওয়ালাকে সে ভালোবাসে, আর অচিরেই সে দেখিয়ে দেবে যে, গল্পওয়ালাও তাকে বাসে।

ঘোষণা দেওয়া সহজ, তার বাস্তবায়ন করা কঠিন।

কিন্তু ভালোবাসা কেবল দৈব-দুর্ঘটনা নয়, ভালোবাসা অনুশীলনেরও ব্যাপার। আমি গল্পওয়ালাকে ভালোবাসি, সুস্মিতা এ কথা বার বার বলতে থাকলে তার কল্‌বের ভেতরে সেই কথার অনুরণন শোনা যায়। আর সত্যি সত্যি দুকূল উপচানো শেকড় উপড়ানো ভালোবাসায় সুস্মিতা পাগলপ্রায় হয়ে ওঠে।

এখন, এই ভালোবাসা সে তার ভালোবাসাকে জানায় কী করে। সে রোজ ভোরে গিয়ে হাজির হয় গল্পওয়ালার বাসার সামনে। গল্পওয়ালা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে ঝোলা কাঁধে, তখন সুস্মিতা তার কাছে যায়, তাকে ডাকে, ও গল্পওয়ালা, একটা গল্প দেবেন। গল্পওয়ালা ততোদিন বেশ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে, দুগ্ধ কোম্পানিগুলো তার গল্প কিনতে শুরু করেছে, ফলে খুচরো গল্প বিক্রি তার পক্ষে পোষায় না, যারা খুচরো গল্প কিনতে চায়, তারা যেন কেনে দুধের প্যাকেট, প্রতিদিন নিত্য নতুন গল্পের নিত্যনতুন প্যাকেট।

আর গল্পওয়ালা পথে ঘাটে এমন প্রস্তাব শুনতেও অভ্যস্ত। যদিও অনেকেই, বিশেষত সুন্দরীরা, এমন সুরেই তাকে ডাকে, তাদের গলায় থাকে এমনই আত্মবিশ্বাসের সুর; কিন্তু পাইকারি গল্পের দাম তারা যখন শোনে, তখন কেনার মুরোদ তাদের থাকে না।

গল্পওয়ালা সুস্মিতার আবেদন শুনতে পায়, তার দিকে বিষণ্ন হেসে তাকায়;

আর এমন সুন্দর সে যে, গল্পওয়ালাকে দ্বিতীয়বার তাকাতে হয়। তৃতীয়বার তাকাবার দরকার হয় না, কারণ দ্বিতীয়বার তাকিয়ে গল্পওয়ালা আর চোখ ফেরাতে পারে না।

'আমি একটা গল্প কিনতে চাই'— সুস্মিতা বলে। তার বুকের মধ্যে দুন্দুভি। তার ফর্সা মুখে শরীরের সব রক্ত উঠে এসেছে, এতোই লাল।

'গল্প। আমি তো খুচরো গল্প বেচি না।' গল্পওয়ালা বলে, কিন্তু তার গলার আওয়াজও একটু কাঁপা কাঁপা শোনায়।

'খুচরো নয়। আমি পাইকারিই নেবো'— সুস্মিতা বলে।

'তাতে দাম পড়বে বেশি। সেটাও খুব বড়ো কথা নয়— যার বড়ো ফ্যাক্টরি নেই, সে গল্প নিয়ে ঘরে রেখে দেবে। তাতে আমার গল্প বেশি সংখ্যক লোকের কাছে পৌছাবে না। সেটা একজন গল্পওয়ালা হিসেবে আমার জন্যে দুঃখজনক। আমি তাই যাকে তাকে গল্প বেচি না।'

'আমি তো যে সে নই।'

'বাহ্। আপনি কে?'

'আমাকে আপনি বলতে হবে না। তুমি করে বলুন।'

'আচ্ছা,' গল্পওয়ালা বিব্রত হাসি দিয়ে বলে, 'তুমি কে?'

'আমি হলাম সুস্মিতা।'

'সেটা তোমার নাম। কিন্তু যে সে নও কেন, সেটা বলো। তুমি কি কোনো ফ্যাক্টরির প্রতিনিধি?'

'না। আমি আমার প্রতিনিধি।'

'সেটা অবশ্যই বড়ো যোগ্যতা। কিন্তু আমার জন্যে এতো বড়ো যোগ্যতা খুব দরকারি নয়। আমি ছাপোষা গল্পওয়ালা মাত্র। ভালো কোম্পানির লোক পেলে গল্প বেচে দেই। এই তো।'

'আমিও খুব নিরীহ সাধারণ একটা মেয়ে। আমার যোগ্যতা হলো, আমি আপনাকে ভালোবাসি। নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। এতো বেশি এতো গভীর এতো বিশাল ভালোবাসা পৃথিবীর কেউ কাউকে কখনো বাসে নি।'

'হুম্। সেটা অবশ্য একটা চিন্তার কথা। তবে কথা কী জানো সুস্মিতা, যে যখন যাকে ভালোবাসে, তখনই তার তাকে এই কথা বলতে হয়। সে মিথ্যা বলে না। সত্যই বলে। তবে এই সত্য কথা এই জীবনে সে আরো অন্তত পাঁচজনকে বলে। গবেষণা করে দেখা গেছে, একজীবনে মানুষ গড়ে ছয়বার প্রেমে পড়ে। তুমি একজন তরুণী, অনন্ত সম্ভাবনা আর অনেক বড়ো ভবিষ্যৎ তোমার সামনে, তুমি কেন আমার মতো একজন বৃদ্ধের প্রেমে পড়বে? তোমার প্রেমে পড়া উচিত একজন তরুণ

তুর্কীর।'

'আপনি যতো সুন্দর গল্প বানান, তেমন সুন্দর করে কথা বলেন না কেন? আপনি এ রকম বাবা-বাবা ভাষায় কথা বলছেন কেন? আপনি আমাকে ভালো নাও বাসতে পারেন, তবে আপনি ভালোবাসার যোগ্য, আমার এ বিশ্বাসটা আপনি অন্তত ভেঙে দেবেন না।'

'না। আমি যা না, তা ভেবে আমাকে তুমি ভালোবাসতে পারো না। আমি যা তাই জেনে আমাকে তোমার ভালোবাসা উচিত, আমি অত্যন্ত কাঠখোট্টা ধরনের মানুষ। আমার জীবনে কোনো রোমান্টিকতার বালাই নেই। আমি নানা উপাদান ছেনে মেখে বেলে গল্প বানাই, গল্প সেঁকি আর বেচি। এই যা। আমি কথায় কথায় হাসির গল্প বলি না। রাতবিরাতে আমি পাহাড় ডিঙাতে বেরিয়ে পড়ি না।'

'আপনি যেমন করে কথা বলছেন, তাতে আমি আরো বেশি মুগ্ধ হচ্ছি। দয়া করে আপনি আমাকে আর পাগল করবেন না। ঠিক আছে, আমি আপনার কাছে গল্প চাই না। কিন্তু একটা গল্পের পাইকারি দাম আমি আপনাকে দেবো। তার বদলে আমি আপনাকে এককাপ চা খাওয়ানোর সুযোগ পেতে যাই।'

'না। আমি এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করি না।' নিজের প্রতিরোধ ভেঙে পড়বার আগেই তাড়াতাড়ি বলে ফেলে গল্পওয়ালা। এতোক্ষণ গল্পওয়ালা মেয়েটির চোখ থেকে চোখ সরায়নি, মেয়েটিও সরায়নি গল্পওয়ালার চোখ থেকে।

চারদিকে ভিড় জমে গেছে, জনতা সাধু সাধু বলে চিৎকার শুরু করেছে— গল্পওয়ালা চোখের পাতা ফেলতেই বুঝতে পারে অবস্থাটা, আর তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে। আর সে তো শুধু গল্পওয়ালা নয়, অলৌকিক গল্পওয়ালা, তাই সবাই ভাবে তাকে, ভিড় ঠেলে তাকে বেরুতে দেখা যায়, কিন্তু মুহূর্তেই সে অদৃশ্য হয়ে কোথায় যে যায়।

সুস্মিতা কিন্তু হতোদ্যম হয় না। গল্পওয়ালার চোখে চোখ রাখার মেয়াদটুকুন তার মনে পড়ে, তার হৃদপিন্ড অপসারিত বলে তার মনে হয়; সে গল্পওয়ালার বাড়ির সামনে না গিয়ে পারে না। রোজ ভোরে সে ওঠে, তারপর দাঁড়ায় ওই কাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যবান বাড়িটির সামনে (সৌভাগ্যবান, কেননা ও বাড়িতে গল্পওয়ালা থাকেন) তারপর যখনই তাকে বেরোতে দেখা যায়, তখনি সে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। প্রথমেই ডেকে বা কথা বলে সে দৃশ্য-নির্মাণ করতে চায় না, চায় না অনাসৃষ্টি বাধাতে, তারপর গল্পওয়ালা যখন নতুন কোনো পথে নেমে পড়ে, তখনই হাঁটতে শুরু করে তার পাশাপাশি। গল্পওয়ালাকে সে কিছু বলে না, তাকে বিরক্ত কিংবা অনুরক্ত করারও কোনো চেষ্টা নেই তার, শুধু এমনভাবে পাশাপাশি হাঁটে যে লোকে ভাবে,

তারা দুটিতে বুঝি একজোট হয়েই পথে নেমেছে।

গল্পওয়ালা প্রথমে ভেবেছিল উপেক্ষা দেখাবে, পাত্তা না দিলেই কেটে পড়বে এই অপ্সরীটি, কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়, রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে মেয়ে প্রতিদিন তার সফরসঙ্গী হয়।

এই নিয়ে শহরে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায় কি যায় না।

শেষে গল্পওয়ালাই মুখ খোলে, 'সুস্মিতা, তুমি এমন করছো কেন? তুমি আমার কাছে কী চাও?'

সুস্মিতা বলে, 'খুবই সামান্য একটা জিনিস আমি চাই আপনার কাছে। তা যদি আপনি আমাকে দেন, তাহলেই আর কোনোদিন আপনার চলার পথে কাঁটা হয়ে থাকবো না'— সুস্মিতার চোখে জল এসে যায়।

'কী জিনিস বলো তো'— গল্পওয়ালা ক্লান্ত ভঙ্গিতে শুধোয়।

'আপনি আমার বাসায় একদিন আসবেন, এক কাপ চা খাবেন।'

'এই তোমার চাওয়া?'

'হ্যাঁ। এই।'

'বেশ। চলো। কবে যেতে হবে?'

'কাল। কাল পারবেন?'

'আচ্ছা। কখন?'

'কাল সকালবেলা আপনি যখন বেরোবেন, আমি আপনাকে এসে নিয়ে যাবো।'

'না। তার দরকার নেই। আমি তোমার বাসায় গিয়ে হাজির হবো। ঠিকানাটা দাও।'

সুস্মিতা তাকে ঠিকানা দেয়, সময়টাও চূড়ান্ত করে নেয়।

আমি তাহলে আসি। সুস্মিতা দৌড় ধরে। কারণ তার এখনো জোগাড় যন্ত্রের অনেক কিছুই বাকি আছে।

সুস্মিতা ভেবেছিল, সে তার ক্লাসের সব মেয়েকে ডাকবে তার বাসায়। সবাই দেখুক গল্পওয়ালার সঙ্গে তার কী রকম ঘনিষ্ঠতা। বাসা ফাঁকাই আছে, মা-বাবা দুজনই দেশের বাইরে, বাসায় আছে কেবল সে আর তার ছোটোবোন আর গৃহপরিচারক-পরিচারিকারা। এ অবস্থায় তার বন্ধুরা আসবে, তারা চুপচাপ থাকবে দোতলায়। আর নিচতলার হলঘরে বসবে সে আর গল্পওয়ালা। তারা চা খাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুস্মিতা এসবের কিছুই করে না। সে বরং তার ছোটোবোনটিকেও পাঠিয়ে দেয় মার্কেটে।

আর ঠিক দুপুরের পরপর, যখন গৃহপরিচারিকাকরা সবাই ঘুমে ঢুলুঢুলু, গল্পওয়ালা তার বাসায় এলে তাকে সোজা নিয়ে যায় তার ঘরটিতে, সেখানে পুরো ঘর জোড়া কেবল গল্পওয়ালার কীর্তিচিহ্ন, গল্পগন্ধযুক্ত দুধের নানা প্যাকেট।

গল্পওয়ালা ক্লান্ত স্বরে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, দাও দেখি এককাপ চা।

'চা তো আপনার জন্যে বানিয়ে রেখেছি।' কেতলির দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে সুস্মিতা বলে।

'ঠান্ডা চা নয় তো।'

'না, কী বলেন। গরমে ঝাঁঝা করছে।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি অনেক সেজে-গুজে থাকবে।' গল্পওয়ালা চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলে। তখন, খুব বিষণ্ন ভঙ্গিতে দুঃখী দুঃখী চোখে তাকিয়ে সুস্মিতা বলে, না সাজলে বুঝি আমাকে সুন্দর লাগে না।

'না। তা বলছি না।'

'কী হবে সেজে গুজে। আপনাকে তো আর আমি ধরে রাখতে পারবো না। ভেবেছিলাম, আমার বন্ধুদের সবাইকে ডাকবো আজকে, সবাই ওই জায়গায় গোপনে দাঁড়িয়ে দেখবে আপনাকে।'

'ভাগ্যিস ডাকো নি। সে ভারি অস্বস্তির ব্যাপার হতো। এই তো ভালো লাগছে। কেউ নেই। আমাকে বিব্রত হতে হচ্ছে না। আমার বিব্রত হওয়াটাও কেউ দেখতে পাচ্ছে না।'

'আপনার কতোটুকু চিনি।'

'দাও। তোমার ইচ্ছামতো দাও।' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলে গল্পওয়ালা।

সুস্মিতা ম্লান হাসে।

চা খেতে আর কতোক্ষণ। গল্পওয়ালা বলে, তা হলে আজ উঠি। সুস্মিতা বলে, উঠবেন। এতো তাড়াতাড়ি। আরেকটু থাকেন না।

'অনেকক্ষণ কিন্তু আছি।'

'ইস্।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'যাহ্। এতো তাড়াতাড়ি আধঘন্টা সময় পেরিয়ে গেলো! আরেকটু থাকুন। আর পনেরো মিনিট।'

আসলে গল্পওয়ালার আরো খানিকক্ষণ বসতে ইচ্ছে করছে। পারলে হয়তো সে সারাটা জীবন এইভাবে বসে থাকতো। আর কিছু নয়, শুধু দুজনে এক নির্জন ঘরে বসে— চায়ের কাপ আর কেৎলি নিয়ে, শুধু এই চা খাওয়া আর গল্প করা। আর কিছু নয়। গল্পওয়ালা সুস্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়— এ মেয়েটি

এই পৃথিবীর নয়। হয়তো অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে সে, হয়তো স্বর্গের ফুল পারিজাতের বোন— পৃথিবীর মালিন্য একে স্পর্শ করেনি। গল্পওয়ালার একবার মনে হয়— মেয়েটাকে ছুঁয়ে দেখি। তখন মনে হয়, তার মলিন স্পর্শ সুস্মিতার সুস্মিত শুদ্ধতাতে মালিন্যের সূচনা করবে। এই হাতে ঠিক সুস্মিতাকে স্পর্শ করা যায় না। নিজের হাতটাকে তার তখন এতো অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। চোখ তার ভেজা ভেজা, সুস্মিতা বলে, গল্পওয়ালা, আমি কি আপনাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি।

গল্পওয়ালা চুপ করে থাকে। অন্য নানা গল্পের ফাঁকে কখন অজান্তে সুস্মিতা গল্পওয়ালার এলোমেলো দুঃখী চুলে আঙুল বুলোতে থাকে। তার চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরতে চায়। কেন চায়!

১২

দিন যায়। সবার দিনই যায়। দোয়েলের ফড়িঙের দিন, কেরানি, বেশ্যা ও ভবঘুরের দিন, ভিক্ষুক আর টোকাইয়ের— কার দিনই বা পড়ে থাকে, আটকে থাকে? গল্পওয়ালার দিন যায়— নিত্য নৈমিত্তিকভাবে। তার স্ত্রী রেবার দিয় যায়, বড়ো বড়ো ঘরদোর সন্তান আর পরিচারিকা সামলে। এর মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে না।

তারপরও ঘটে।

এ শহরে ধীরে ধীরে একটা নতুন পেশা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে, তার নাম চাঁদাবাজি। একদল নতুন পেশাজীবী সাফল্য ও দক্ষতার তুঙ্গে চলে যায়— চাঁদাবাজ। শহরে যে যাই করতে যাক না, চাঁদাবাজদের ট্যাক্সো না দিয়ে সে তা করতে পারবে না। নিজের জমিতে নিজের কষ্টার্জিত পয়সা খরচ করে তুমি বাড়ি বানাও, তোমাকে দিতে হবে চাঁদা। জমিতে ইট পড়তে দেখামাত্রই দফায় দফায় আসতে থাকবে নানা চাঁদাবাজদল। একেকটি দলের দাবি একেকরকম। যে দল শক্তিশালী, যাদের হাতের অস্ত্রটা নতুন আর চকচকে, আর যাদের পেছনে আছে ক্ষমতাসীনের আশীর্বাদ বা অংশগ্রহণ, তারা হয়তো দাবি করে বসবে তোমার পুরো বাড়ি বানাতে যতো টাকা লাগে, তার সবই। যারা ছিচকে চাঁদাবাজ, মাদকের টাকা যোগাড় করাই হয়তো তাঁদের প্রধান লক্ষ্য, তারা হয়তো ফিরে যাবে দুচারশ হাতে পেলেই— হয়তো, আবার আসবে তারা। তুমি রাস্তায় গাড়ি নামাতে চাও, চাঁদা দিতে হবে, দোকান চালাতে চাও, ঠিকাদারি কাজ করতে চাও, চাঁদা দিতে হবে, অনুষ্ঠান করতে চাও, চাঁদা দিতে হবে— তোমার ঘরে দুটো সোমত্ত মেয়ে আছে, চাঁদা দিতে হবে সে কারণেও। আর এ শহরের যে প্রধান কর্তা, তিনি নিজেই বিভিন্ন ব্যক্তি ও ধনীর

কাছে চাঁদা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন চেয়ারে বসার আগে, এখনো ভেট পেলে তিনি খুশি বই অখুশি হন না। তার সঙ্গোপাঙ্গরাও তাই চাঁদা তোলে— বিপুল উৎসাহে। কাজেই শহরের আর সব উদীয়মান, উদিত ও অস্তগামী মাস্তানেরা যে চাঁদাকে পরিণত করবে বায়ুসাগরে বাস করার মতো স্বাভাবিক ব্যাপারে— তাতে আর সন্দেহ কী!

এখানে চিকিৎসক চিকিৎসা দিতে বসতে পারে না চাঁদাবাজদের জুলুমে, শ্রমিক মাটি কাটতে পারে না, দেহব্যবসায়ীরা তাদের দেহব্যবসা চালাতে পারে না চাঁদাবাজদের চাঁদা না দিয়ে। তুমি মদ বেচো, তবু চাঁদা দাও, তুমি দুধ বেচো, তুমিও চাঁদা দাও। এমনকি যে বাস্তুহারারা খোলা আকাশের নিচে কাটিয়ে দেয় একেকটি রাত, তাকেও সেখানে শুতে হয় চাঁদা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়েই, যে ভিক্ষুক ভিক্ষা করে কোনো মতে দিনগুজরান করে, ফুটপাতে থালা পাতবার আগে তাকেও খুশি করতে হয় চাঁদাবাজদের।

গল্পওয়ালার চলার পথেও শুরু হয় চাঁদাবাজদের অত্যাচার। একটা লোক 'চাই গল্প' 'চাই গল্প' বলে হেঁকে যাবে, আর গরম গরম গল্প বেচে ঝোলায় ভরবে টাকা, অথচ সে চাঁদাবাজদের সালাম ও সেলামি দেবে না, তাও কি হয়?

কিছুদিন থেকেই দুটো লোক তাকে নিমতলা মোড়ে উত্যক্ত করে আসছে। গল্পওয়ালা ঠিক পাত্তা দেয়নি। কিন্তু এরপর তাদের চাওয়া এতো সরাসরি পর্যায়ে চলে আসে, যে, পাত্তা না দিয়ে উপায় থাকে না। তারা বলে দেয়, কালকের মধ্যে একলাখ টাকা তাদের দিয়ে যেতে হবে, এই নিমতলার মোড়েই। তারা এই টাকা দিয়ে তাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী করবে। শুনে শূন্যদৃষ্টিতে গল্পওয়ালা তাকায় লোক দু'টোর দিকে। তাদের এলোমেলো চুল, চোখ লাল, গালে দু'দিনের দাড়ি, গায়ে ঢোলা জামা, পরনে আঁটো সাটো ট্রাউজার।

তারা যখন কথা বলছে, তখন আগ্নেয়াস্ত্র একবার ট্রাউজারের পকেটে, একবার জামার পকেটে রাখছে।

'কাইলকার ভিতরে ট্যাক্স না পাইলে কইলাম খবর আছে। ভুঁড়ি ফাসায়া দিমু'— তারা বলে।

গল্পওয়ালা কিছু বলে না। শুধু দু'জায়গায় খবর দেয়। একটা জায়গা হলো দুগ্ধ কোম্পানির সমিতি। আসলে এখন শহরের পাস্তুরিত দুধের ব্যবসা পুরোটাই নির্ভর করছে গল্পওয়ালার ওপর, তার নিরাপত্তা ও সম্মানের দায়িত্ব তাই তাদের। আর খবর দেয় শহরের নিরাপত্তা প্রধানের স্ত্রীর কাছে। গল্পওয়ালার দৃঢ় বিশ্বাস, নিরাপত্তা প্রধান যদি তাকে নাও চেনেন, তার স্ত্রী অবশ্যই চিনবেন তাকে। সত্যি সত্যি নিরাপত্তা প্রধানের বেগম তাকে চিনতে পারে। ফোনে যখন তাদের কথা হয়, তখন মিসেস

নিরাপত্তা উত্তেজনায় শ্বাস নিতে পারছিলেন না, তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন।

'আপনি সত্যি গল্পওয়ালা?'

'হ্যাঁ। আমি সত্যি গল্পওয়ালা।'

'আপনি এমন মজার মজার গল্প বানান কী করে! আপনি কি মানুষ?'

'আপনারা যদি মানুষ হিসেবে আমাকে স্বীকৃতি দেন।'

'আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। আপনি এখন কোথায়?'

'বাসায়।'

'আমি কি এখন আপনার বাসায় আসতে পারি?'

গল্পওয়ালা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে, কেননা এখন রাত প্রায় ন'টা, এতো রাতে একজন ভদ্রমহিলা তার বাসায় আসতে চাইছে। কিন্তু সে রাজি হয়— কেননা নয়তো তাকে কতোগুলো গুন্ডাপান্ডার সামনে মাথানিচু করে চলতে হয়।

'আচ্ছা, আসুন।'

সে রেবাকে জানিয়ে দেয় যে মিসেস নিরাপত্তা আসছেন।

রেবা অবশ্য খুশিই হয়।

মিসেস নিরাপত্তা প্রায় দেড়ঘন্টা পরে আসেন। তখন, গল্পওয়ালার মহল্লায় সাইরেন বাজতে থাকে আর লাল আলো একবার জ্বলে আরেকবার নেভে। মহল্লায় নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যাপক আনাগোনা দৌড় ঝাঁপ অবস্থানগ্রহণের মধ্য দিয়ে মিসেস নিরাপত্তার আগমন ঘটে।

যা দেরি হয়েছে তার জন্যে তিনি দায়ী নন, দায়ী পারলারের ঢিলা বিউটিসিয়ান, তিনি জানাতে কসুর করেন না। তার সঙ্গে সঙ্গে নামে তার দু'ছেলেমেয়ে আর ছ'নাতি নাতনি। এরা সবাই ঝাঁপিয়ে ছয় তলায় ওঠে। মিসেস নিরাপত্তা প্রথমে গল্পওয়ালাকে খুবই ভালোভাবে নিরীক্ষণ করেন। তারপর বলেন, হ্যাঁ, আমার মনে হয় আপনি মানুষ।

'কীভাবে এতো নিশ্চিত হলেন ম্যাডাম?' গল্পওয়ালা জানতে চায়।

'বুদ্ধি খাটিয়ে। বুদ্ধিটাই আসল'— মিসেস নিরাপত্তা বলেন, 'আপনার যদি বুদ্ধি থাকে, তো আপনি শ্বশুরবাড়িতেও খেটে খেতে পারবেন। আমি দেখলাম, আপনার শরীরের ছায়া পড়ে কিনা। হ্যাঁ পড়ে। কাজেই আপনি মানুষ। দুই, আপনার পা মাটিতে পড়ে কিনা। পড়ে। কাজেই আর সন্দেহ থাকে না। আমি কি আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলতে পারি?' বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে গল্পওয়ালার কোলে কাঁধে সব ছেলেপুলে উঠে পড়ে, আর তার একপাশে ঝুলে পড়ে মিসেস নিরাপত্তা

নিজে। গল্পওয়ালার শ্বাসরোধ হয়ে আসতে পারতো, কিন্তু আসে না। তার বাঁ পাশে মিসেস প্রধান, তিনি তার এক হাত পেঁচিয়ে ধরেছেন, তখন গল্পওয়ালার এই রকম মনে হয় যে, সে বুঝি একটা তুলোর কোলবালিশ ধরে আছে। মহিলা যাবার আগে বলে যান যে, গল্পওয়ালার গল্প তিনি খুবই ভালোবাসেন, তাই সারাক্ষণ শুধু গল্প-ফ্লেভারড দুধই খান, আর কিছুই খান না। এ-ছাড়াও তিনি এই গল্পভরা দুধ দিয়ে নিজের ঘরে আইনক্রিম বানাতে পারেন, যা হয় অনবদ্য, সারাক্ষণ আইসক্রিম খাওয়ার লোভও তিনি সম্বরণ করতে পারেন না।

তারপর তারা সিঁড়ি কাঁপিয়ে নিচে নেমে যান। গল্পওয়ালা বলে, লিফ্‌ট আছে তো। সিঁড়ি ভাঙছেন কেন। মিসেস প্রধান বলে, আমি লিফ্‌টে উঠলে অ্যালার্ম বাজে, লেখা ওঠে, কাইন্ডলি শেষ দুজন নেমে যান। এই লিফ্‌ট ছয় জনের জন্যে।

হা-হা-হা। মহিলা হাসেন। এটা কি সত্য নাকি রসিকতা গল্পওয়ালা বুঝে উঠতে পারে না।

এরপর থেকে গল্পওয়ালার আর কোনো ভয় থাকে না। রাস্তায় তার বহুবর্ণিল ঝোলাটা নিয়ে সে নির্বিঘ্নে আর প্রায় নির্ভয়েই ঘুরে বেড়ায়। শোনা যায়, যে দুজন চাঁদাবাজ গল্পওয়ালাকে হুমকি দিয়েছিল, তাদের খোদা-বাবারা তাদের ডেকে পাঠিয়ে অ্যায়সা ধমক লাগায় যে, তারা আঁটো ট্রাউজার আর কার্পেট ভিজিয়ে ফেলে।

তখন লোকে বলাবলি করে যে, আসলে নিরাপত্তারক্ষী আর চাঁদাবাজ সবাই একই সুতোয় বাঁধা। তুমি যদি সুতোর গোড়ায় হাত দিতে পারো, তাহলে তোমার আর কোনো ভয় নেই।

ভয় নেই, তবুও ভয় থেকে যায়। গল্পওয়ালার ওপর বোধ হয় ছিঁচকে চাঁদাবাজদের রাগ রয়েই গেছে।

একদিন গল্পওয়ালা ফিরছে, ক্লান্ত পায়ে। সেদিন তার শরীরটা ভালো ছিল না বলে বেলা ডোবার আগেই সে বাসার দিকে রওনা দিয়েছে। তিন নম্বরের গোল চক্করটা বাঁয়ে রেখে, চিরঅসমাপ্ত নির্মীয়মাণ ভবনটার সামনের নির্জন রাস্তাটায় এসে তার কেমন গা ছম ছম করে। এই ভবনের ভেতরে কতোগুলো ছেলে তাস খেলে আর মাদক-টাদক সেবন করে— এরকমই জানা যায়। গল্পওয়ালা সচরাচর এই পথ মাড়ায় না, তবে আজ শরীর ভালো নয় বলে পথসংক্ষেপ করতে গিয়ে সে এদিকটায় এসে পড়েছে।

সে হাঁটার গতি একটু বাড়িয়ে দেয়। তার বুকটা কেন যেন কেঁপে ওঠে। আরেকটু গেলেই সামনে একটা বস্তি পড়বে। তাতে গরিব অভাবী মানুষেরা আছে। ভেতরে হয়তো গাঁজা ধেনো মদ-টদও পাওয়া যায়। তবু এই বস্তির সামনে পৌছাতে

পারলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে বলে গল্পওয়ালার মনে হয়।

গল্পওয়ালা জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। তার নিজের পায়ের শব্দে সে নিজেই চমকে চমকে ওঠে। হঠাৎ কী হয়, কোত্থেকে দুটো শুকনো লকলকে লোক তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। তারা কোনো কথা বলে না। দুজনে গল্পওয়ালার দুহাত দুদিক থেকে ধরে ফেলে। ডান পাশের জন গল্পওয়ালার ডান হাত ধরে এমন একটা প্যাঁচ কষে যে, গল্পওয়ালার পা আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে আসে— সে উফ্ বলে একটা ব্যথাক্লিষ্ট ধ্বনি ছেড়ে বসে পড়ে। তখন, এই টিঙটিঙে লোক দুজন তার কাঁধের ঝোলাটা ধরে টানাটানি করতে থাকে। গল্পওয়ালা প্রাণপণে ঝোলার হাতল আঁকড়ে ধরে। কিন্তু লোক দুজন— তারা এতো শুকনো মনে হয় জীন কি অলৌকিক কিছু, আর তাদের গায়ে এতো জোর যে এই সন্দেহ আরো প্রবল হয়— এমন কষে টান মারে যে, ঝোলার হাতল গল্পওয়ালার দশআঙুলেই ধরা থাকে, কিন্তু ঝোলার আসল অংশ ছিঁড়ে চলে যায় লিকলিকে লোক দুটোর হাতে। তারা উল্লাসে 'ও আমার জান, তোর বাঁশি যেন জাদু জানে রে' বলে গান গেয়ে ওঠে।

তখন গল্পওয়ালা মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায়, বলে যে, ওই ঝোলায় কিছু নেই, সব গল্পই বিক্রি হয়ে গেছে, এর বদলে তার পকেটে কিছু টাকা আছে, সে সব তারা নিতে পারে। কিন্তু লোকগুলো তার কথা খুব বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। বিশ্বাস না হয় দেখো বলে গল্পওয়ালা তার জামার পকেট হাতড়াতে থাকে, এবং বিপদে পড়লে যা হয়, পকেট হাতড়েও কোনো টাকা পাওয়া যায় না। বাঁ পকেটে তার হাত আপনাআপনিই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই লোক দুটো তাকে ধরে ফেলে আর হেইয়োঁ বলে তাকে নিয়ে দৌড়ুতে আরম্ভ করে। বিমান কিংবা শকুন আকাশে ওড়ার আগে যেমন করে বেশ খানিক দৌড়ে নেয়, তেমনি করে তার দুই ডানা ধরে তারা দৌড়ায়, আর গল্পওয়ালার মাথা সামনের দিকে, পা পেছনে দিকে, তার ঝুলন্ত পা উড়তে থাকে। তার মনে হয়, এরা ছেড়ে দিলেই সে আকাশে উড়তে থাকবে। তারা তাকে ছেড়ে দেয়, ছাড়ার আগে ছুড়েও মারে, ফলে বেশ খানিকক্ষণ গল্পওয়ালা শূন্যে উড়তে থাকে, তখন তার কানের পাশ দিয়ে বাতাস কাটছে, সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে, আর তার প্রাণপাখি পিঞ্জিরা ছাড়ি-ছাড়ি। লোকগুলো উল্টোমুখো হয়ে দৌড় ধরে এবং মুহূর্তেই অন্তর্হিত হয়। আর বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়তে উড়তে একসময় বিমানের মতোই তার অবতরণের পালা আসে, আর ক্র্যাশল্যান্ডিঙের ধরনে সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। কাঁধে ঝোলাটা না থাকায় সে দুই হাত ঠিকভাবে স্থাপন করতে সমর্থ হয়। ফলে মুখ থুবড়ে পড়ার হাত থেকে সে বেঁচে যায় অল্পের জন্যে। কিন্তু দু'হাতে এমন ব্যথা লাগে যে, সে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাটিতে পড়ে সে

খানিকক্ষণ নীরব থাকে, তারপর তার ধড় থেকে গোঁ গোঁ ধরনের শব্দ হতে থাকে।

সে যেখানে পড়ে, সেখান থেকে বস্তি আর অল্প কয়েক পা দূরে। তার পতনটি শব্দহীন হয় না। বরং বেশ বড়োসড়োই একটা ধুপ আওয়াজ ওঠে।

বস্তির এ মাথায়, একটা ছোট্টো মেয়ে একটা বড়ো বস্তার মুখ খুলে সারাদিনে তার টোকানো জিনিসগুলো ঘাঁটাঘাটি করছিল। সে সকালবেলা বেরিয়ে ছিল এই বস্তাটা নিয়ে, গেছে একটার পর একটা ডাস্টবিনে, আর টুকিয়েছে কাগজ, শিশি-বোতল, এটা-ওটা নানা কিছু। তার কুড়োনো সব কিছুই সে ভরে রেখেছে তার বস্তায়। এখন, তাদের ঘরের সামনে, বস্তার মুখ খুলে সে ভেতরের জিনিসপাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করছে।

হঠাৎ ধুপ করে আওয়াজ শুনে সে প্রথমে ভয় পায়, পর মুহূর্তেই তার মনে জাগে কৌতূহল। এই সময়ে বস্তি থাকে ফাঁকা ফাঁকা, একেবারেই পঙ্গু আর অথর্ব ছাড়া বিকেলবেলা সাধারণত কেউ বস্তিঘরে থাকে না, সবাই তো এখানে শ্রমজীবী, তাদের দিন শুরু হয় সূর্য ওঠার আগে, আর দিন শেষ হয় সূর্য ডোবারও অনেক পরে। আজ এখনো সূর্য ডোবেনি তো।

মেয়েটি দেখতে পায়, কী একটা বড়ো-সড়ো জিনিস ওই ওখানে সশব্দে পড়ে গেলো।

সে তার বস্তার সম্পদরাশি ফেলে রেখে দৌড় ধরে ওই দিকে। আহারে, এইডা তো একটা ব্যাটা! কেমন কইরা পড়ছে ব্যাটায়!

মেয়েটা যায় গল্পওয়ালার কাছে। তার মাথার কাছে বসে। তার নিঃশব্দতায় প্রথমে ভয় পেয়ে তার নাকের কাছে কান লাগিয়ে পরীক্ষা করে সে বেঁচে আছে কিনা। তারপর গল্পওয়ালা যখন গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে, তখন সে বুঝতে পারে, এই ব্যাটায় বাঁইচা আছে।

এখন সে এই মুমূর্ষুকে নিয়ে কী করে?

সে দৌড়ে তাদের বস্তিঘরে যায়। কলসিতে পানি ভরা ছিল। সে এক ঘটি পানি ঢেলে নিয়ে আবার দৌড়ে আসে অকুস্থলে। গল্পওয়ালার মাথাটা সে টেনে নেয় নিজের কোলের ওপর, আর ঘটি থেকে পানি নিয়ে ছিটিয়ে দেয় আহতের চোখেমুখে। তারপর হাতের পাঞ্জা ভিজিয়ে নিয়ে লোকটার লম্বাটে চুলে সে চিরুনির মতো আঙুল বুলোতে থাকে।

গল্পওয়ালা ধীরে সংবিৎ ফিরে পায়। তবু সে খানিক চোখ বুজে থাকে, দুর্বলতায়। তারপর চোখ মেলে। তখন সে তার মাথার ওপর দেখতে পায় এক মাথা লাল কোঁকড়া চুল, বড়ো বড়ো চোখ, ধ্যাবড়া নাক নাকের নিচে সর্দি— এক মিষ্টি

মায়াবী বালিকা। গল্পওয়ালা বুঝতে পারে না, তাকে দেবীর মতো শুশ্রূষা দিচ্ছে— এ কে? এ কি মানবী, নাকি দেবদূতী! হাতের ব্যথাটা কনকনিয়ে উঠলে সে টের পায় যে, সে এখনো মর্ত্যেই পড়ে আছে।

'উইঠা বইতে পারবেন?'

গল্পওয়ালা উঠে বসার চেষ্টা করে।

'না না আপনেরে আমি উইঠা বইতে কই নাই। আপনি হুইয়াই থাকেন। খালি জিগাইছি— শরীলটায় বল পান, নাহি পান না?'

গল্পওয়ালা বলে, 'ব্যথা পেয়েছি হাতে। আর সব ঠিক আছে। ধরে বসিয়ে দাও।'

মেয়েটা তাকে উঠে বসতে সাহায্য করে।

'আপনারে হাসপাতালে নিতে হইব নাকি? লাগলে কন। ঝামেলা হইব। বস্তিত তো সব নুলা লেংড়া মানুষ। কামের মানুষ সব আইবো সানুঝের পর।'

'না। আমাকে হাসপাতালে নিতে হবে না। আমি আসলে খুব ভয় পেয়ে গেছি। এখনো আমার ভয় লাগছে। তুমি আমাকে তোমাদের বস্তিতে নিয়ে চলো।'

'যাইবার পারবেন।'

'হ্যাঁ পারবো। পা ঠিক আছে। শুধু হাতে ব্যথা। উ-হু-হু।'

মেয়েটা তাকে ধরে, গল্পওয়ালা ধীরে ধীরে হেঁটে বস্তির মাথায় এসে পৌঁছে।

'ঘরের ভিতুরে যাইবেন?'

'হ্যাঁ। ভয় লাগছে।'

'আহেন।'

তারা বস্তির চালার ভেতরে ঢোকে। ঘন অন্ধকার। বাজে ভ্যাপসা গন্ধ। খুব নিচু চালা।

'বহেন। বাতি জ্বালাই।'

'বাতি লাগবে না। অন্ধকারই ভালো।'

গল্পওয়ালা অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে, বেশ খানিকক্ষণ।

রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে ওঠে, ঘরের ভেতরে তার আলো এসে পড়ে। মশা ভন ভন করছে। আশেপাশের বস্তিঘরে বোধ হয় কেরোসিনের ল্যাম্পো কি চুলা জ্বালানোর আয়োজন চলছে, তারই গন্ধ নাকে এসে লাগে।

মেয়েটা বাইরে যায়, ফিরে আসে একটা সবুজ সস্তা আইসক্রিম হাতে করে। বলে, 'আপনার লাইগা কিইনা আনলাম। আপনি খাইয়া মাথা ঠান্ডা করেন।'

'দাও। বরফ লাগালে আমার হাতের ব্যথাটা কমবে। তুমি যদি অনুমতি দাও

এই আইসক্রিমটা আমি হাতে লাগাতে চাই।'

'হাতে লাগাইবেন। দ্যান, আমি লাগাইয়া দেই।' মেয়েটি আইসক্রিমটা গল্পওয়ালার হাতে ব্যথার জায়গায় ধরে।

'তোমার নাম কী?' গল্পওয়ালা বরফের কামড় অনুভব করতে করতে জিজ্ঞেস করে।

'ফুলি'— মেয়েটি বলে। রাস্তার আলোয় তার মুখটা কেমন অপার্থিব দেখায়।

'এই জায়গাটায় নাম কী?'

'এটা হলো জনসভাবস্তি। এই শহরে যতো জনসভা হয়, এই বস্তি থাইকা লোক সাপ্লাই দেওন হয়।'

'তাই নাকি!'

'হ। জনসভা হয় দুই ধরনের। বিশাল জনসভা, আর বিরাট জনসভা। বিশাল জনসভায় লোক লাগে বেশি। তখন বস্তির লোকগুলানের পাও ভারি হইয়া যায়। দাম দেওয়া লাগে বেশি। আর যদি বিরাট জনসভা হয়, তখন লোক বেশি, টেরাক কম। মানুষের দাম যায় কইমা।'

'ফুলি তুমি কোনোদিন গেছো জনসভায়?'

'হ। খালি একবার। লইতে চায় না। কয়, পোলাপান লওন যাইবো না। শ্যাষে শাড়ি পিইন্দা ঘোমটা দিয়া উইঠা পড়ছি।'

'টাকা পেয়েছো?'

'না। যহন ট্যাকা দ্যায়, মাথা থাইকা ঘোমটা গেলো খুইলা। হ্যারা ট্যার পাইয়া গেলো। কয় বলে, যা ছেমরি, ভাগ। অহন ক্যামন লাগে। খানিক ভালা?'

'হ্যাঁ। ভয়টাই পেয়ে গিয়েছিলাম বেশি। বুকটা কাঁপছিল। এখন ভালো লাগছে। যেতে পারবো। যাই। তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো।'

গল্পওয়ালা ওঠে। পকেট হাতড়েও টাকাপয়সা কিছু পায় না। ঝোলার মধ্যেই রেখেছিল নাকি?

'শোনো। আমি কাল আবার আসবো। তোমার জন্যে একটা ছোট্টে পুরস্কার নিয়ে আসবো।'

'যান গা যান গা। পুরস্কার-টুরস্কার লাগতো না। বড়োলোক গো কথা। হি হি হি।' ফুলি হাসে।

রাস্তার আলোয় সেই হাসিকে খুবই রহস্যময় বলে মনে হয়।

কী দেওয়া যায় ফুলিকে, ভেবে ভেবে সারা হয়ে যায় গল্পওয়ালা। রেবাকে

সে ঘটনার কিছু কিছু বিবরণ দেয়, শুধু সে যে বেশ ব্যথা পেয়েছে, সে অংশটি চেপে যায় পুরোপুরি। রাতের বেলা, দোতলার ডাক্তারকে ফোন করলে তিনি ছুটে আসেন, আর হাত টিপে দেখে 'ও কিছু না' বলে সাধারণ বেদনানাশক ওষুধ খেতে দেন। তারপর, পুরো ব্যাপারটার আকস্মিকতার ঘোর কেটে গেলে, নিজের নিরাপত্তাহীনতা, ঝোলাটা হারানোর ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি ছাপিয়ে গল্পওয়ালার কাছে বড়ো হয়ে ওঠে ফুলি নামের এক বস্তিবাসিনী বালিকার মায়া-ছল ছল চোখ।

মেয়েটাকে কী দেয়া যায়? এক সদ্যনির্মিত গল্প? গল্পটা নিয়ে সে কী করবে? সুতোয় টান দিয়ে দিয়ে শুনবে? তাতে কী লাভ?

তাহলে কি টাকা দেবে মেয়েটাকে? একটা ছোটো মেয়ের হাতে টাকা দেওয়া কি উচিত? তাহলে অন্য কিছু কিনে দিতে হয়।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে রাত মেলা হয়ে যায়। গল্প আর বানানো হয় না। হাতে ব্যথা বলে পেইন কিলারের সঙ্গে ঘুমের বড়ি খেয়ে গল্পওয়ালা ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে তার দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে পুরো শহরে লণ্ডভণ্ড অবস্থা শুরু হয়ে গেছে।

১৩

স্কুলে গিয়েছে শিশুরা, তাদের সঙ্গে স্কুলব্যাগ আর টিফিন বাকসো, আর পানির পাত্রে পানি। ক্লাসে শিক্ষিকা পড়াচ্ছেন, এলিফ্যান্টের আগে এন বসে, হঠাৎই এক ছাত্র, ওয়াটার-ফ্লাস্ক থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে নিলো, অমনি তার ভূগোল গেলো পাল্টে, সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে এক হাতির পিঠে, সেই হাতির চোখ ছোটো, ফলে পৃথিবীর অন্য সব কিছুকে সে দেখছে বড়ো বড়ো, এই মাত্র একটা পিঁপড়াকে দেখে হাতি বলছে— আসসালামু আলায়কুম। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ সভা হচ্ছে, পরিচালকমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সভা, হঠাৎই সভাপতি খেয়ে নিলেন এক গ্লাস পানি, এই পানি তিনি এনেছেন বাসা থেকে ফুটিয়ে; তারপর ধীরে ধীরে পরিচালকের বক্তৃতার বদলে তার কানের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলো গল্প— এক হাতি আর এক তরুণ মাহুত আটকা পড়েছে এক ফাঁদে, অন্য কিছু বন্য হাতির সঙ্গে, কিন্তু বাইরের মানুষেরা জানে না, তারা ফটক বন্ধ করে দিয়েছে। হোটেল-রেস্তোঁরায় মানুষ ট্যাপের পানি খাচ্ছে, আর তাদের চারদিকের আলো যাচ্ছে বদলে, গল্পের টুকরা-টাকরা অংশ গুন গুন করতে শুরু করে দিয়েছে তাদের মাথার চারপাশে, কানের কাছে— তারা কেউ হাসছে, কেউ কাতর হয়ে পড়ছে দুঃখে। চোর কিংবা পুলিশ, মন্ত্রী কিংবা

ক্যাডার, ঘুসখোর কিংবা গাঁজাখোর— কোনো বাছ-বিচার নেই; হঠাৎ হঠাৎ সবাই আক্রান্ত হয়ে পড়ছে গল্পে।

ব্যস্ত রাজপথে কার গায়ে কে উঠিয়ে দিচ্ছে গাড়ি, কোন্ সহিস পাগলের মতো ছুটিয়ে দিচ্ছে ঘোড়া, কোন্ রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছে ভুল স্টেশনে, অপারেশন থিয়েটারে পেট কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার পর এক ঢোক জল খেয়ে ডাক্তার ভুলে যাচ্ছে কাটা-ছেঁড়া সেলাইয়ের কাজটুকু সারতে, প্রেমিকের উড়ন্ত চুম্বন প্রেমিকার গালে না পড়ে পড়ছে কোনো স্কুলশিক্ষকের গালে— নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে চরম।

আর রোগটাও ধরে ফেলছে সবাই। অনেকটা একই সঙ্গে। এ যে গল্পওয়ালার গল্পের টুকরো অংশ। ছেঁড়া অংশ। মাথায় ঢুকছে। ভাগ্য ভালো যে, সামান্য সময় পরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে সবাই।

ব্যাপার কী, জানার জন্যে, সকাল থেকে ফোনের পর ফোন আসতে থাকে, কিন্তু ফোনের রিংগার অফ করা, গল্পওয়ালা ঘুমুচ্ছে। তারপর শহর কর্তৃপক্ষ লোক পাঠিয়ে দিয়েছে গল্পওয়ালার বাসায়। যেহেতু কর্তৃপক্ষীয় লোকজন মিনারেল ওয়াটার খান তাদের সমস্যা হয়নি। মাথা ঠিক আছে।

শহর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের হাঁক-ডাকে ঘুম ভাঙে গল্পওয়ালার। রেবা গেট খোলে। সাধন তখন অবশ্য ইশ্‌কুলে। ব্যাপার কী? রেবা ভয়ার্ত গলায় বলে।

'স্যারকে ডাকেন, স্যারকে ডাকেন'— লোকগুলো বলে। ঘুম চোখে হাই তুলতে তুলতে গল্পওয়ালা বসবার ঘরে আসে।

'কী হয়েছে?'

'স্যার। আপনার গল্প লিক করেছে স্যার। সারা শহরের লোকজন কথা নেই-বার্তা নেই, আপনার গল্পের কোনো একটা বাক্য, কোনো একটা অনুচ্ছেদ সেবন করে ফেলছে। ব্যাপার কী স্যার?'

সোফায় বসে খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে নেয় গল্পওয়ালা। তারপর তার সবকিছু মনে পড়ে যায়। গতকাল বিকেলে দুটো টিংটিঙে লোক তার ওপর চড়াও হয়েছিল। তারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার গল্পের ঝোলা। গল্পের ঝোলায় গল্প ছিল না বটে। তবে সে এই ঝোলা কোনোদিন পরিষ্কার করেনি। ফলে এতোদিনের বানানো গল্পগুলোর নানান টুকরো-টাকরা, গল্পের গুঁড়ো নিশ্চয় রয়ে গেছে ঝোলায়। পরিমাণে সেও নেহায়েত কম নয়। এখন এই সব গল্প কোনোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে।

গল্পওয়ালা বলে, 'তাই তো। গত বিকেলে আমার গল্পের ঝোলা চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু রাতারাতি পুরোটা শহরে গল্প ছড়িয়ে দিতে পারলো কী ভাবে?'

'কারা চুরি করেছে?'

'তাতো জানি না। দুজন টিংটিঙে লোক। দেখে মনে হয় ঠিক মানুষ না, জিন— এমন পাতলা আর এমন বলবান।'

'থানায় ডায়রি করেছেন?'

'না তো।'

'এই তো ভুল করেন। তো স্যার আপনি বলুন, আপনি কী মনে করেন? গল্পটা শহরময় ছড়ালো কীভাবে?'

'দেখুন। দূষণ হয় দুটো মাধ্যম দিয়ে। পানি আর বাতাস। এই চোরগুলো হয় গল্প গুঁড়ো করে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। নয়তো ছড়িয়েছে পানির মাধ্যমে। সেটাই অবশ্য সহজ। আপনারা এক কাজ করুন, শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প এলাকা সফর করুন। ওখানে ঠিকভাবে অনুসন্ধান করুন। আমার মনে হয়, ওই পানির ট্যাংকে কেউ গল্প মিশিয়ে দিয়েছে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার।'

লোকগুলো বেরিয়ে যায়। রেবা কাঁদতে শুরু করে। 'এখন কী হবে গো?'

'কী আর হবে? সামান্য কিছু গল্পগুঁড়ো। পানির লাইনের সাথে মিশিয়ে দিলেও কিছু যায় আসবে না। প্রত্যেকের ভাগে পড়বে একটা দুটো লাইন। কাজের মধ্যে একটু ঝামেলা হবে, দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে সব। দুগ্ধ কোম্পানিগুলো তো হিসেব করে নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ব্যালেন্স করে প্রয়োজনমতো গল্প মেশায়— এদেরটা একেবারেই কাঁচা কাজ। কেঁচিয়ে দিয়েছে। একেবারে কেঁচিয়ে দিয়েছে।'

তখন নগর আর নিরাপত্তারক্ষীরা উঠে পড়ে লাগে ঘটনার তদন্তে। তদন্ত করতে তেমন কষ্ট হয় না। পানি সরবরাহ প্রকল্প এলাকায় গিয়ে প্রধান ট্যাংকে টর্চলাইট মারতেই দেখা যায়— ভেতরে কী যেন ভাসছে।

ভাসছিল অবশ্য বহু কিছু। শহর কর্তৃপক্ষ সে তালিকাটা দেয়নি। ট্যাংকে পাওয়া যায় প্রচুর পলিথিন ব্যাগ, ভাঙা স্যুটকেস, ছেঁড়া ছাতা, একটা মড়া বেড়াল, প্রচুর গাছের ডাল ও পাতা, টায়ার, স্যান্ডেল, জুতা। এসবের ভেতর থেকেই বের করে আনা হয় যা খোঁজা হচ্ছিল আর কী! গল্পওয়ালার বিখ্যাত ঝোলাটা।

তখন খবরের কাগজের স্পেশাল টেলিগ্রামের শিরোনাম হয়— গল্পওয়ালার ঝোলা উদ্ধার করা গেছে। নিরাপত্তারক্ষীরা গল্পের ঝোলাটা সামনে রেখে পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে।

এই সব নিয়ে ঝামেলা করতে গিয়ে সারাটা দিন চলে যায় অকারণে। গল্পওয়ালা এমনিতেই আগের রাতে গল্প বানাতে পারে নি। আজ দিনের বেলা

বেরুতেও পারেনি গল্প ফেরি করতে। আর দুগ্ধ কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা তার কাছে এসে ভিড় করে— স্যার, সর্বনাশ হয়ে যাবে স্যার— একদিন যদি আমরা দুধে গল্প মেশাতে না পারি, কোম্পানি লাটে উঠবে স্যার। সেটাও বড়ো কথা নয়, শিশুরা দুধ খাবে না, তারা কতো কষ্টে ভুগবে সারাদিন ভেবে দেখুন। আর অন্য কোম্পানিগুলো ভালো করে ফেলবে আমাদের চেয়েও। বাজারে অন্যদের ঢুকতে দেবার দরকার কী!

'তাহলে আপনারা আমার ঝোলাটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন।' গল্পওয়ালা বলে দুগ্ধ কোম্পানির লোকদের।

তথাস্তু বলে তারা বিদায় নেয়। আর সন্ধ্যা হবার আগেই তারা ফিরে আসে গল্পের ঝোলাটা নিয়ে। এটা তারা ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ করে একেবারে শুকিয়ে টুকিয়ে এনেছে।

সন্ধ্যা নাগাদ সারা শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। শুধু শহরের মানুষ একযোগে ট্যাপের জল খাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। ফলে জল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। আর সরবরাহকৃত পানি ফুটিয়ে না খাওয়ার দরুণ অনেকেই পেটে সামান্য ব্যথা অনুভব করতে শুরু করে।

বস্তির লোকেরা, যারা কোনোদিন গল্পদুধ খায়নি, বিনিপয়সায় গল্প সেবন করার উদ্দেশ্যে তারা বস্তির মুখের পানির ট্যাপে ভিড় করে। এই প্রথমবারের মতো গল্পওয়ালার হৃদয়-ছেয়ে-ফেলা গল্পের স্বাদ পায় তারা! আহা বেচারারা! কী গেলাটাই না তারা গেলে ওই গল্পপানিটুকুন!

গল্পের ঝোলা ফিরে পেয়ে আর শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার খবর পেয়ে রাতে আবার গল্প বানাতে বসে গল্পওয়ালা। রোজকার মতোই।

ফুলি, জনসভা-বস্তির ছোট্টো মেয়েটা, রাতের বেলা তার শ্রমজীবী মা আর বাবা ফিরে এলে মাকে বলে, মা, কাইলকা সক্কাল সক্কাল ডাস্টবিনে কাগজ কুড়াইতে যাইবার পারুম না।

'ক্যান? পারবি না ক্যান? গতরে ত্যাল হইছে?' তার মা ঝাঁঝালো গলায় খেঁকিয়ে ওঠে।

'পারুম না। কাম আছে। সকালে এক ব্যাটায় আইবো।'

'এই বয়সে লাং ধইরা ফালাইছোস নি? সকালে কোন্ ব্যাটা আইবো তোর লাইগা?'

'লাং না। এক ব্যাটা কাইল এইহানে ফিট হইয়া গেছলো। আমি তারে

চোখে মুখে পানি ছিটাইছি। ব্যাটায় কইছে সকালে আমার লাইগা কী জানি একটা পুরস্কার আনবো। আইবো না তো জানি। ভদ্দরলোকের কথা। আইজ রাইতেই ব্যাটা ভুইলা গেছে গা। তাও থাহি। যদি আইয়া পড়ে। ভদ্দরলোক আইয়া যদি আবার আমারে না পায়, দুঃখ পাইবো না।'

'আর তুই যদি সকালে হের লাইগা খাড়ায়া থাইকা দেখোস, হেই আহে নাই, তখন তোর খারাপ লাগবো না?'

'না মা। গরিব মাইন্ষের খারাপ লাগনের আছে টা কী?'

ফুলি রাতের বেলা এটা ওটা স্বপ্ন দেখে। কাল বিকাল বেলার দুঃখী মানুষটা তার জন্যে এনেছে একটা ইয়া বড়ো বিড়ালছানা। বিড়ালের বাচ্চাটা আবার চোখ পিটপিট করে।

ফুলি তাকে বলে, এই বিলাই দিয়া আমি কী করুম?

লোকটা বলে, আরে এতো সত্যি সত্যি বিড়ালের ছানা নয়। ক্ষীরের তৈরি। এ হলো ক্ষীরের পুতুল।

পরদিন সারাটা সকাল ফুলি বসে থাকে তার বস্তিঘরের সামনে। ছটফট করে। একবার দুইবার যায় লাইটপোস্টের কাছে। লোকটা আসে না কেন? রোদ বাড়ে। সকাল গড়িয়ে গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়। কিন্তু সেই দুঃখী লোকটা এদিকটায় আসে না।

'না আসুক। বড়োলোক গো বিশ্বাস কী।' ফুলি ঠোঁট কামড়ায়। দুপুর গড়িয়ে যেতে শুরু করলে সে তার বস্তাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে যেতে হবে তাকে। টোকাতে হবে কাগজ, শিশি, বোতল, পলিথিন ব্যাগ। এর মধ্যে যদি কিছু মূল্যবান সামগ্রী জুটে যায়। একবার এক টোকাই ডাস্টবিনে এক পলিথিন ব্যাগের মধ্যে এক মানিব্যাগে অনেক টাকা পেয়েছিল। আরেকবার ওই বস্তিঘরের সোনামিয়া পেয়েছিল একটা আংটি। ফুলির কপালে কিছু নেই। ডাস্টবিনের নোংরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ফুলি ভাবে, আইজ যদি এককেজি মতো কাগজ না টোকাইতে পারি, মা খানকিটার খ্যাকানি প্যাদানিতে জান কেরাসিন হইয়া যাইবো— ফুলি আপন মনেই বিড়বিড় করে।

না। সেই দুঃখী লোকটা, যার হাতে চোট লেগেছিল, আর ফুলি নিজের পয়সা দিয়ে যার জন্যে কিনে এনেছিল সবুজ আইসক্রিম— আর আসে না। বদলে আসে একটা বুলডোজার। আর আসে পুলিশ। জনসভা-বস্তি অবৈধ আর এলাকাটা একটা ক্রাইম জোন। এর আগে শহর-কর্তৃপক্ষ তিন তিন বার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এ বস্তি ছেড়ে চলে যাওয়ার, কিন্তু এলাকাবাসী শোনেনি। আজ আর ক্ষমা নেই।

আসে বড়ো বড়ো ট্রাক। বস্তিবাসীদের যারা ঘরে ছিল, তাদের সবাইকে তোলা হয় ট্রাকে।

লেগে যায় হুলস্থুল। চিৎকার চেঁচামেচি হৈচৈয়ের মধ্যে বুলডোজার তার অপারেশন শুরু করে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল, দিনের আলো থাকতে থাকতেই অপারেশন শেষ করার। কিন্তু খবর পেয়ে আসে জনসভার দালালেরা। তাদের মধ্যস্থতায় আরো চব্বিশঘন্টা সময় পায় বস্তিবাসীরা। পরের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জনসভা-বস্তি সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয়ে যায়।

তারপর শহর-কর্তৃপক্ষ আর নিরাপত্তা-কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করে গল্পওয়ালার সঙ্গে। আপনার ওপর হামলা হয়েছিল যে স্পটে, ওটা আসলে ছিল একটা ক্রাইম জোন, ওই যে জনসভা-বস্তিটা, ওটা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

তখন গল্পওয়ালার মনে পড়ে ফুলির কথা। মেয়েটাকে সে একটা কিছু উপহার দিতে চেয়েছিল। দিতে পারেনি। বরং যা উপহার দিতে পেরেছে, তা হলো উচ্ছেদ। জনসভা-বস্তি থেকে শুধু তারই কারণে উচ্ছেদ হয়ে গেছে ফুলিরা।

১৪

গল্পওয়ালা আবার বেরোয় তার গল্প নিয়ে। পিঠে যথারীতি তার পুরোনো ঝোলা। ইতিমধ্যে তার গল্পের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেছে, কারণ সরবরাহকৃত পানির মাধ্যমে সাধারণ মানুষও পেয়ে গেছে গল্পের কিছু কিছু স্বাদ। পানির সঙ্গে গল্পের এই মিশ্রণ বৈজ্ঞানিকভাবে সাধিত নয়, ফলে একেকজন পেয়েছে গল্পের একেক বাক্য, একেক চরিত্র— তাদের মধ্যে সে সবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও হয়েছে বিভিন্ন। তবে, এই হৈচৈয়ে যা বেড়ে গেছে, তা গল্পওয়ালার নামধাম। এবং দাম। এখন দুগ্ধ কোম্পানিগুলো তাকে আরো বেশি করে চায় আর তার নামেই দুধ বিক্রি বেড়ে গেছে অনেক বেশি। ইতিমধ্যে তাকে একটা নতুন ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে একটা কোম্পানি। ফ্ল্যাট মাত্রই নির্মাণাধীন, সুতরাং এখনো নতুন ফ্ল্যাটে ওঠা হয়নি গল্পওয়ালার।

গল্পের ঝোলা কাঁধে তবু গল্পওয়ালা হাঁটে। কাল রাতে সে বানিয়েছে আরো ক'টি নতুন গল্প। এবারের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলো নোনা।

সেসব পিঠে নিয়ে সে এমন উত্তেজনা ও দ্বিধা নিয়ে হাঁটে, যেন সে এক নতুন লেখক। এই একটা জিনিসের কিছুতেই কুলকিনারা করতে পারে না সে, প্রতিটা পিঠা বানানোর আগে তার মনে হয় সে পারবে না, এইবার সে ব্যর্থ হবে, আবার একেটা আইডিয়া তাকে উত্তেজিত করে বালকের মতো, তারপর যখন একেকটা গল্প বানানো হয়ে যায়, সে এমন হয়ে যায়, যেন সে খুনের আসামী, আর ভোক্তারা হলো

জজসাহেব, তাদের মতের ওপর নির্ভর করছে তার জীবন-মৃত্যু। এতোদিন হয়ে গেলো, নবীনসুলভ এই উত্তেজনা তার কিছুতেই যায় না।

গল্পওয়ালা হাঁটতে হাঁটতে জনসভা-বস্তির দিকে যায়। সকাল বেলা। সূর্যের আলো সরাসরি তার মুখে এসে পড়ছে। সে বাঁ হাতটা কপালের ওপর রেখে ছায়া বানায়। চোখটা একটু আরাম পায়।

জনসভা-বস্তির এলাকায় গিয়ে তার বুকটা ছ্যাঁক করে ওঠে। বস্তিটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, জায়গাটা ফাঁকা, শুধু রয়ে গেছে মানব বসতির নানান চিহ্ন। প্রাচীরের পাশে কোথাও কোথাও ছিল বস্তিবাসীর চুলা, সেই জায়গাগুলো কালো হয়ে আছে। কারো কারো ছিল নিকোনো উঠোন, রয়ে গেছে। একটা দুটো সবজির গাছ, এখনো মাথা উচুঁ করে জানিয়ে দিচ্ছে— এখানে মানুষ ছিল, ছিল মানুষের হাসি-কান্না, তন্দ্রা-জাগরণ— ছিল জন্ম-মৃত্যুর কোলাহল। সবকিছু সঙ্গে নিয়ে মানুষগুলো চলে গেছে।

গল্পওয়ালা বুকে সামান্য ব্যথা অনুভব করে। একটা গাছ যদি কেটে ফেলে দেওয়া হয়, হঠাৎ সে জায়গাটায় দাঁড়ালে কী নেই কী নেই লাগে— এই শূন্যতা বুকে এসে ঠিকই সৃষ্টি করে অনির্বচনীয় বেদনা। নদী যদি হয়রে ভরাট কানায় কানায়, হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ, তাকে কী মানায়।

ফুলির কথা মনে পড়ে! কী ভাবছে এই মেয়েটা? কী ধারণা হলো তার— মানুষের সম্পর্কে। ধারণা হলো এই যে, মানুষ হলো এক অকৃতজ্ঞ জীব। মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন কতো কথাই বলে, আর বিপদ কেটে গেলে? তুমি কে, কী চাও!

আর মেয়েটা! এমন মায়াবী এক শিশু। তার লাল কোঁকড়া ঝাকড়া চুল। বড়ো বড়ো চোখ। ফুলির কথা ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় গল্পওয়ালার। সে চোখ মোছে। ফুলিদের বস্তিঘরটা ঠিক কোথায় ছিল, বোঝার চেষ্টা করে। সেই জায়গাটায় গিয়ে চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। রোদের তেজ বাড়ছে। মাথাটাও একটু ঝিমঝিম করছে। গল্পওয়ালার মনে হচ্ছে সে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু এই দুর্বলতা ক্ষণিকের! আবার মন শক্ত করে সে। আবার সে হয়ে যায় পুরোদস্তুর গল্পওয়ালা। কাকের ডাকের ফাঁকে, চিলের ডাকের মতো তীক্ষ্ণ করুণ স্বরে আবার সে ডেকে ওঠে— গল্প নেবেন, গল্প, গল্প নেবেন গল্প।

গল্পওয়ালা এগোয়। কিন্তু সে কোনো খদ্দের পায় না। তার স্বাক্ষর সংগ্রাহকরা সচরাচর এই ডাক শুনলেই খাতা কলম নিয়ে দৌড়ে আসতে থাকে, যদিও তারা ঘরদোর ছেড়ে রাস্তায় এসে পৌঁছবার আগেই সে পৌঁছে যায় অন্য রাস্তায়, অন্য কোনো গলিতে। কিন্তু আজ এই পাড়ায় তেমন কোনো সাড়া শব্দও সে পায় না।

ব্যাপার কী? শহরটা কি পরিণত হয়েছে মৃতের শহরে? সে কি হাঁটছে

মহেনজোদারো হরপ্পার পথে?

ব্যাপারটা জানা যায় মোড়ের পানের দোকানে। পানের দোকানদার তাকে দেখে সালাম দেয়, বলে স্যার, একটা পান খাইবেন নাকি? আজ স্যার বাজার খারাপ। কাস্টোমার নাই। একটা খিলিপানও বিক্রি হয় নাই। টেলিভিশনে স্যার ক্রিকেট খেলা দেখাইতেছে। তার উপর স্কুলগুলানের ফাইনাল পরীক্ষা। তার উপর আবার ভিডিও দোকানগুলান স্পেশাল মূল্যহ্রাস ঝুলায়া রাখছে। আইজ আর কেউ রাস্তায় আসতো না।

'ও। তাহলে এই ঘটনা।'— গল্পওয়ালা এগিয়ে যেতে থাকে।

একটা গলির মুখে হঠাৎ সে শুনতে পায়— গল্পওয়ালা ও গল্পওয়ালা। গল্পওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। খুবই অন্ধকার স্যাঁতসেতে এক গলিমুখ। সেখানে একটা অল্প বয়সী মেয়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে। কতোই বা বয়স হবে মেয়েটার। ছয় কি সাত। গল্পওয়ালার মনে পড়ে যায় ফুলির কথা। ফুলি অবশ্য এর চেয়ে আরেকটু বড়োসড়োই হবে। আর ফুলির চুল ছিল কোঁকড়ানো। এর চুল কোঁকড়ানো নয়। বরং লম্বা। ছেড়ে দেওয়া। মেয়েটা ঘাড়টা একটু ঝাঁকাতেই চুলটা পাশে চলে এলে গল্পওয়ালা টের পায় এর চুল অনেক লম্বা। তার পরনে একটা ফ্রক। আর পায়ে একজোড়া বড়ো স্যান্ডেল। সে সম্ভবত তার মায়ের স্যান্ডেল পরে এসেছে। বাচ্চারা বড়োদের স্যান্ডেল পরতে বড়ো ভালোবাসে।

মেয়েটা আবার ডাকে, 'গল্পওয়ালা ও গল্পওয়ালা।'

গল্পওয়ালা তার কাছে আসে, বলে, 'কী খুকি আমাকে ডেকেছো?'

'গল্পওয়ালা আমাকে একটা গল্প দেবে?'

গল্পওয়ালা মুশকিলে পড়ে। কারণ এটা তার পেশাগত নীতির ব্যাপার, সে বিনিপয়সায় কাউকে গল্প দেয় না। আর তার গল্পের এখন বিরাট দাম, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়ানো দুগ্ধ কোম্পানির লোকেরাই কিনে নেয় তার নতুন একেকটা গল্প, যে যেটা পায় আর কী। সে সবের দাম উঠে গেছে সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

গল্পওয়ালা বলে, 'হ্যাঁ। দিতে পারি। কিন্তু দাম দিতে হবে?'

'দাম মানে কী? টাকা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কাছে তো টাকা নেই।'

'তাহলে তোমার কাছে আমি গল্প বিক্রি করবো কেমন করে?'

'বারে আমি টাকা পাবো কোথায়? আমার আম্মা বলেছেন, ছোটোদের হাতে কখনো টাকা দিতে নাই।'

'তাই বুঝি। তোমার আম্মা অবশ্য ঠিকই বলেছেন।'

'কিন্তু আপনার একটা গল্প কিনতে চাই। জানেন, আমি না আপনাকে খুব পছন্দ করি।'

'তাই নাকি।'

'আপনার গল্প খুব ভালো। দারুণ!'

'তুমি আমার গল্প পেলে কোথায়?'

'বাহ্‌রে! সেদিন ট্যাপের পানিতে আপনার গল্প চলে এসেছিল না।'

'ও। তাইতো! অতোটুকুন গল্প পেয়েই তুমি আমাকে পছন্দ করে ফেললে?'

'না। শুধু অতোটুকু নয়। আকাশী প্যাকেজে আপনার গল্প একবার ছড়ানো হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এই গল্পটা গিলেছি। অবশ্য আমাদের বাসায় তো বোকা-বাক্‌সো নেই। পাশের বাসায় যেতে হয়েছিল।'

'এছাড়া তুমি আর কোনোদিন আমার গল্প চেখে দেখোনি।'

'না।'

'কেন, তোমাদের বাসায় দুধ রাখা হয় না।'

'না।'

'তুমি কোনোদিন বাজারের দুধ খাওনি?'

'না। আমরা তো গরিব ধরনের মানুষ। আমার বাবা দিনরাত খাটেন। দুটো চাকরি করেন। তবু বাবা বড়োলোক হতে পারেন না। আমার মাও সারাদিন খাটেন সংসারের পেছনে। তবু আমাদের সংসারের উন্নতি নেই। গল্পওয়ালা, আপনার একটা গল্প আমাকে দিয়ে যান না।'

'আমার যে একটা নিয়ম আছে মা, আমি টাকা ছাড়া গল্প বেচি না।'

'ও! কিন্তু আপনার কাছে এমন গল্প নেই যে গল্প বিক্রি হয় না। কেউ কেনে না। দুধওয়ালারা কেনে না। বোকা-বাকসো কেনে না। একদম পচা ধরনের গল্প। বিনি-পয়সায় সাধলেও কেউ নেবে না এমন গল্প। তাহলে আমি আমার মাটির ব্যাংকটা ভেঙে আপনার কাছ থেকে সেই গল্পটা কিনে নেবো।'

'না রে মা। আমার কাছে এরকম কোনো গল্প নেই।'

'কোনো দুঃখের গল্প নেই? যে সব কেউ সাধ করে কিনবে না?'

'দুঃখের গল্প! সে সব তো আরো দামি। মানুষ দুঃখের গল্পই তো বেশি দাম দিয়ে কেনে। কেন যে কেনে, সে এক রহস্য।'

'ইস্। তাহলে আমার কোনো গল্পই শোনা হবে না।'

গল্পওয়ালা আবার তাকায় মেয়েটির দিকে। ছোট্ট মেয়েটি কেমন মুখ-ভার করে দুঃখী দুঃখী ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। তার ভাসা ভাসা চোখ কেমন জলে টলমল করছে।

সেই সময়, ঠিক সেই সময়, এই কংক্রিটের জঙ্গলের কোথায় একটা ঘুঘু ডেকে ওঠে— একটানা মন্দ্রস্বরে— ঘু ঘু। নবীন দুপুরে ভরা নির্জনতায় সেই ডাক হৃদয় মন আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন প্রতিটি ভবনের সংক্ষিপ্ত ছায়াও মায়া ছড়ায়।

গল্পওয়ালার মনে হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফুলি। যে তাকে ছায়াময় শুশ্রূষা দিয়েছিল, আর বিনিময়ে পেয়েছে বাস্তুচ্যুতি। একে অবশ্যই তার একটা গল্প দেওয়া উচিত। কিন্তু একে দেওয়ার মতো গল্প এখন একটিও নেই তার ঝোলায়। কোনো অবিক্রিত গল্প, গল্পচূর্ণ নেই ঝোলায়। কেননা, দুই টিংটিঙে ছিনতাইকারী সবটাই ধুয়ে ঝেড়ে মিশিয়ে দিয়েছে পানির ট্যাংকে।

গল্পওয়ালা বলে, খুকি, তোমার নাম কী?

মেয়েটি বলে, নাম দিয়া কাম কী?

তা ঠিক, তা অবশ্য ঠিক। নাম দিয়ে কী কাজ তার। সে তো ফুলির নামও জিজ্ঞেস করেছিল, জেনে নিয়েছিল।

তবুও, খুবই ক্লান্তভঙ্গিতে গল্পওয়ালা বলে, তোমার নাম ঠিকানা আমি মনে রাখতে চাই। আজ রাতে আমি তোমার জন্যে একটা গল্প বানাবো। কাল সকালে এসে সেই গল্পটা দিয়ে যাবো তোমাকে।

মেয়েটা বলে, 'আমার নাম হাসনাহেনা।'

'বাহ্। খুব সুন্দর নাম তো।'

'মনে রাখতে পারবেন?'

'হ্যাঁ। পারবো।'

'শুধু হাসনা কিংবা শুধু হেনা মনে রাখলে কিন্তু চলবে না। ওই গলির ভিতরে হাসনা আছে দুইজন। আর হেনা আছে তিনজন। তার মধ্যে দুইজন ছেলে, একজন মেয়ে।'

'আচ্ছা। হাসনাহেনা নামটাই মুখস্থ রাখবো। তোমার বাড়ি কোন্‌টা।'

'ওই ড্রেনের পাশে খয়েরি দরজা, নিচটায় শ্যাওলা। ওটা।'

'ঠিক আছে হাসনাহেনা। আমি তাহলে আজ আসি। কাল এখানে ঠিকই আসবো। সকাল সকাল আসবো। কেমন?'

'আচ্ছা।'

গল্পওয়ালা মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে থাকে। কয়েকপা ফেলার পর তার মনে হয়, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। আজ রাতে গল্প বানিয়ে কাল সকালে এসে হয়তো দেখা যাবে— এই পাড়াটাই উঠে গেছে। নয়তো কাল সকালে সে আটকা পড়বে তাদের বিল্ডিঙের লিফ্‌টে, অ্যালার্ম বাজানোর পরেও দারোয়ান টের পাবে না। সে আটকে থাকবে, আটকেই থাকবে। আবার একটা মেয়ে, যে দেবদূতীর মতো নিষ্পাপ, পারিজাতের মতো সুন্দর— তার পথ চেয়ে কাটিয়ে দেবে বেলা, আর সে আসবে না। কথা না রাখার পাপে সে পড়বে দ্বিতীয়বারের মতো।

গল্পওয়ালা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। যা করার এখনি করতে হবে। এই মেয়েটাকে সে একটা গল্প বলবে। এখনই, নিজ মুখে। সত্যি বটে, সে বলবে সেই গল্প, যা কেউ কোনোদিন কিনতে চাইবে না, শুনতে চাইবে না। যা কোনোদিন কাউকে সে বলেনি, বলবেও না। কেবল নিজের ছায়ার কাছে যে গল্পটা বলা যায়।

গল্পওয়ালা ফিরে তাকায়। গলির মুখে মেয়েটিকে আর দেখা যায় না। সে এদিক ওদিক তাকায়। না, নেই। মেয়েটি কি তার বাসায় ঢুকে গেছে। সে গলির মুখে ঢুকে পড়ে। পাকা গলি। কিন্তু শ্যাওলা পড়া। চিকন, নানা ময়লা পড়ে আছে। সে খয়েরি আর শ্যাওলা-সবুজ দরজাটার সামনে দাঁড়ায়। দরজায় ধাক্কা দেয়। দরজা খোলে হাসনাহেনা। বলে, কী ব্যাপার। আবার কী হলো।

'হাসনাহেনা আমি ঠিক করেছি আজকেই তোমাকে একটা গল্প বলবো। এখনই। তুমি শুনবে?'

হাসনাহেনা খুব মধুর করে হাসে। 'শুনবো তো।'

তারা বসে হাসনাহেনার বাসার দরজায়। পাশাপাশি মেঝেতে বসে পা ছড়িয়ে দেয় গলিতে।

গল্পওয়ালা বলে— 'এক দেশে ছিল এক বেকার মানুষ। সে কোনো কাজ পারতো না। শুধু বসে বসে গল্প বানাতে পারতো। প্রথম প্রথম সে আশেপাশের লোকদের মধ্যে পরিবেশন করতো তার বানানো গল্প। লোকেরাও সেসব গল্প উপভোগ করতো খুব মন দিয়ে। আর তারিফ করতো তার গল্পের।

'লোকটা বেকার, কাজ নেই কর্ম নেই, আর পেটে ভাত নেই। কিন্তু তারো তো একটা সংসার আছে। ছোটো হোক খাটো হোক সংসার তো।' গল্পওয়ালা দম নেয়।

'তারপর'— হাসনাহেনা বলে।

'তারপর লোকটা ভাবলো, এভাবে যাকে তাকে গল্প না সেধে সে তো গল্পগুলো বিক্রি করতে পারে। তার তো আর দোকান ছিল না। দোকানের পজেশন

ছিল না। তখন সে করলো কী, গল্পগুলো সব একটা ঝোলায় ভরে ঝোলাটা পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো পথে— হাঁকতে লাগলো— গল্প নেবেন, গল্প।'

'তারপর?'

'প্রথম প্রথম অবশ্য তার গল্প খুব একটা কেউ কিনতো না। কিন্তু খুব শিগগিরই লোকজন বুঝে ফেললো গল্পের মজা। লোকজন তার গল্প উপভোগ করছে, সেসবের তারিফ করছে— লোকটাও পেয়ে গেলো মজা।'

'তারপর?'

'লোকটা সারারাত জেগে জেগে গল্প বানায়। এখান থেকে ওখান থেকে যোগাড় করতে হয় উপকরণ, গল্পের মালমশলা। সে সব একখানে করো রে, ঠিকমতো জ্বাল দাও রে। কাজ তো আর কঠিন নয়। লোকটা সেই কাজ করতো পরমানন্দে। গরম গরম গল্প থলেয় পুরে একেকদিন সে বেরিয়ে পড়তো পথে। সারাদিনে সবক'টা গল্প বিক্রি হয়ে যেতো। দিনশেষে লোকটা ফিরতো শূন্য ঝোলা নিয়ে, আর ভরা পকেট নিয়ে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার তাকে বসতে হয় গল্পের ঝোলাটায় গরম গরম গল্প ভরতে। পরদিন আবার সে বেরিয়ে পড়ে পথে। সব গল্প বিক্রি হয়ে যায়।'

'তারপর?'

'আবার সে শূন্য ঝোলা নিয়ে ঘরে ফেরে। ভরা পকেটে। তখন আবার তাকে বসতে হয় গরম গরম গল্প বানাতে।'

'তারপর?'

'রোজ লোকটা একই কাজ করে। কিন্তু তার মনে হয়, দুরো, আমি রোজ রোজ একই কাজ করছি কেন? এ তো ভীষণ একঘেঁয়ে। সে ভাবে, তার থামা উচিত।'

'হুঁ।'

'কিন্তু সে থামতে পারে না। রোজ ঘরে ফিরে যখন সে দেখতে পায় তার গল্পের থলে শূন্য, তখন তার ভেতরে কী যে এক উন্মদনা দেখা দেয়, কী যে এক দুর্নিবার নেশা— সে আবার বসে যায় গল্প বানাতে। তখন তার খুব খারাপ লাগে। কান্না পায়। কিন্তু সে কাঁদে না। কারণ সে জানে, তার অশ্রু যদি ভুলে পড়ে যায় তার গল্পের মধ্যে, তার স্বাদ হবে ভীষণ নোনা। এতো নোনা কেউ পছন্দ করবে না।'

'তারপর?'

'তাকে তাই কান্না চেপে যেতে হয়। অশ্রু সংবরণ করতে হয়। কিন্তু সে কাঁদে। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল না ফেলেও সে কাঁদে। সেই অশ্রু-লুকানো

রোদনহীন কান্না কাঁদা যে কত কষ্টের।'

'লোকটা কাঁদে কেন?'

'কারণ তাকে রোজ রোজ গল্প বানাতে হয়।'

'তাহলে লোকটা রোজ রোজ গল্প বানায় কেন?'

'না বানিয়ে সে থাকতে পারে না।'

'তাহলে সে কাঁদে কেন?'

'কী জানি কেন!'

'তাহলে সে গল্প বানানো থামাতে পারে না কেন?'

'কী জানি কেন!'

'আহা বেচারা। লোকটার বুঝি খুব দুঃখ।'

'হ্যাঁ। খুব।'

'কেমন?'

'ওই লোকটা যে পথ দিয়ে যায় তার সারা পথে দুঃখ আঁকা হয়ে যায়।'

ঘুঘু ডাকে। এই শহরে, বৃক্ষহীন ইটপাথরে ভরা রুখো রাগী কঠিন শহরে কোথা থেকে এক ঘুঘু খুব উদাস করা স্বরে ডাকে।

গল্পওয়ালা কাঁদতে থাকে। তার চোখে অশ্রু নেই। কণ্ঠে রোদন নেই।

হাসনাহেনা তার ছোট্ট আঙুল তুলে তবু লোকটার অশ্রু মুছতে যায়। তখন ধীরে ধীরে এক ফোঁটা দু ফোঁটা জল ঝরতে থাকে গল্পওয়ালার দুই চোখ থেকে।

১৫

গল্পওয়ালার দিনরাতগুলো এখন অশ্রুময়; অবশ্য ফোঁটা ফোঁটা জল নয়, বাষ্প, তার সারাটা দিন আর সারাটা রাত ছেয়ে থাকে বাষ্পকণা। তার বুকের মধ্যে যেন একটা পাষাণ বসে ছিল, ওই পাষাণকবাটের অর্গল খুলে গেছে— এখন তা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সব আবেগ। কিন্তু আবেগের বল্গাহীন প্রকাশের লোক গল্পওয়ালা নয়।

তবু তারও একটু এলোমেলো হতে সাধ হয়। মনে হয়— এই সাজানো ছকবদ্ধ, বৃত্তাবদ্ধ জীবন সে ভেঙে ফেলে; রাত আর দিনের এই আবর্তনের বাইরে সে গিয়ে দাঁড়ায়— কোথাও কোনোখানে।

সেদিন গল্পওয়ালা আর সন্ধ্যাসন্ধি বাসায় ফিরে আসে না। সে হাঁটতে থাকে শহরের বাইরে তার প্রথম বাসস্থলের দিকে।

তাকে খুবই অন্যমনস্ক আর এলোমেলো দেখায়। তার চুল এলোমেলো,

উসকোখুশকো, খাড়াখাড়া। তার দৃষ্টি বিহ্বল।

গল্পওয়ালা হাঁটছে আসলে বাকেরের দোকানের দিকে। ওখানে, দোকানের পেছনের ছোট্টো পরিসরটিতে, কুসুম নামে এক নারী আছে। কুসুমকে মনে হয় সে জন্ম নিয়েছে বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে, বৃত্ত ভেঙে দেওয়ার জন্যে। তার বেদেনির মতো কোমর, সাপিনীর মতো ফণা। শক্তপোক্ত সেই শরীরে যেন অমাবস্যার আদুরে স্পর্শ। আর শৈত্য। গল্পওয়ালা যাবে তার কাছে। চুপিসারে দাঁড়াবে দোকানের পেছনে। বাঁশের বেড়ার পাল্লা খুলবে। দেখতে পাবে, কেরোসিনের চুলোয় হাঁড়ি চাপিয়ে তার আলোয় মুখ রাঙিয়ে বসে আছে কুসুম। হাঁড়িতে তখন বলক উঠছে। হাঁড়ির মুখ থেকে শানকি সরে সরে যাচ্ছে ভেতরের বাষ্পের চাপে।

গল্পওয়ালা গিয়ে দাঁড়াবে তার সামনে। তার চোখে চোখ রাখবে। কুসুম আশ্চর্য শীতল চোখে তাকাবে গল্পওয়ালার দিকে। গল্পওয়ালা তার চোখে চোখ রাখবে। তাকে বশীভূত করবে। সাপুড়ে যেমন সাপের চোখে চোখ রেখে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ রাখে।

তারপর গল্পওয়ালা বেরিয়ে আসবে বেড়ার বাইরে। কুসুমও আসবে। নিশ্চয় আসবে।

তারা বাঁধটা পেরুবে। তারপরের জায়গাটা জলা আর জংগলময়। কিছু কিছু চষা ক্ষেতও আছে। ধান কিংবা গম। আর আছে বালিকারাশি।

গল্পওয়ালা আগে আগে, কুসুম পিছে পিছে। আজ অমাবস্যা। চাঁদ নেই। বাঁধের ওপরের নেই বিদ্যুতের আলোও। তারপর সেই অন্ধকারে মিশে যাবে গল্পওয়ালা আর কুসুম। জঙ্গলের আড়ালে কাদাহীন মালিন্যহীন বালি-শয্যায় তারা শুয়ে পড়বে। অবারিত আকাশের নিচে দুই মানবমানবী। সুতোহীন। তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরবে। অন্ধকার যতোক্ষণ তাদের আড়াল করে রাখতে পারে— তারা শুয়ে থাকবে। বুকের সঙ্গে বুক মিশিয়ে দিয়ে।

গল্পওয়ালা তার প্রাক্তন মহল্লায় যখন পৌঁছায়, তখন সেখানে বিদ্যুতও নেই। আকাশে অনেক তারা। সপ্তর্ষিমন্ডল বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে ভেসে আছে।

ওই যে দূরে বাকেরের দোকান দেখা যাচ্ছে। কেরোসিনের প্রদীপ জ্বলছে। অনেক মোটা সলতে। তার বড়ো শিখা। তার বেশি কালি। দূর থেকে কালচে ধোঁয়ার ওড়াটাও অনুধাবন করার চেষ্টা করে গল্পওয়ালা।

দোকানে বসে আছে দুজন— আরেকটু কাছে গিয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে গল্পওয়ালা— কারা বসে আছে দোকানে। রাস্তায় অন্ধকার। লোক চলাচল কম। অন্ধকার। দাঁড়িয়ে.কেরোসিন শিখার কম্পমান আলোয় গল্পওয়ালা বেশ দেখতে পায়

দুজনকে— কুসুম আর বাকের। কাঁপা কাঁপা আলোয় তাদেরও কম্পমান দেখায়।

গল্পওয়ালা আরেকটু এগোয়। এবার অনেকটা পথ ঘুরে সে যায় দোকানের পেছন দিকে। যাতে গল্পওয়ালাকে তারা দেখতে না পায়। কিন্তু তাদের কথাবার্তা যাতে গল্পওয়ালা বেশ স্পষ্ট শুনতে পায়।

গল্পওয়ালার কানে কোনো সংলাপ আসে না। যা আসে তা চুড়ির টুংটাং শব্দ। যা আসে তা কুসুমের চুড়িভাঙা হাসি। গল্পওয়ালা বুঝি পান চিবুচ্ছে। তার পিক ফেলার শব্দ হয়। তারপর সে যে কী বলছে, পান মুখে তা ঠিক ফুটে উঠছে না। তখন কুসুম আবার হাসিতে ভেঙে পড়ে। দুরো, আর হাসাইও না তো। বোধ হয় কুসুম ঢলে ঢলে পড়ছে, গলে গলে পড়ছে।

গল্পওয়ালা চুপ করে শোনে। তার বুকে একটা পাথর কে যেন চেপে দেয়। ভারি পাথর। বরফের শীতলতম পাথর। তারপর নিঃশব্দ পায়ে সে অকুস্থল ত্যাগ করে।

ঘন অন্ধকার। শহরের উপকণ্ঠের এক মেঠো গ্রাম, মেঠো শহুরে পথ। রাত কতো হয়েছে কে জানে, ইতিমধ্যেই নেমে এসেছে রাজ্যের নিঃস্তব্ধতা। অবশ্য ঝিঁঝি ডাকছে, অবশ্য বাদুড় উড়ছে, অবশ্য কী একটা জিনিস— পাখি নাকি পতঙ্গ— চামচিকা বুঝি— এমন দ্রুতগতিতে চলাচল করছে মাথার ওপর। শেয়ালের ডাকও শোনা যায়। তাকে অনুসরণ করে এক ঝাঁক কুকুরেরও ডাক। অন্ধকারে গল্পওয়ালা হাঁটে।

সে জানে না সে কোথায় যাবে।

অন্ধকারে, আরো অন্ধকারে, অন্ধকারের একদম পেটের ভেতর, নাকি ওই যে দূরে, নগরের আলো দেখা যাচ্ছে, সেদিকটায়।

গল্পওয়ালা নগরের দিকে হাঁটে। ফিরে যেতে চায় তার সেই বৃত্তাবদ্ধ কোণটিতে। সেই নৈমিত্তিক চক্রে।

সেখানে ফিরে যেতে তার ভালো লাগে না।

তাহলে সেখানে তুমি কেন যাও? হাসনাহেনার গলায় প্রশ্ন উচ্চারিত হয়।

'জানি না।' গল্পওয়ালা বিড় বিড় করে।